হৃষীকেশ-সিরিজ,—নং ১

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সম্পাদিত

বেঙ্গল বুক কোম্পানী

৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা

১৩২৭

মূল্য দুই টাকা মাত্র

বেঙ্গল বুক কোম্পানী হইতে
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভারত-মিহির প্রেসে ১ম হইতে ৭ম ফর্ম্মা,
আর, মনো এণ্ড কোংর প্রেসে
৮, ৯, পরিশিষ্ট ১, ২ ফর্ম্মা ও টাইটেল পেজ,
উৎসর্গপত্র, সূচী, নিবেদন প্রভৃতি
ও
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ফর্ম্মা
মুদ্রিত হইয়াছে

যাঁহার কৃপায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ও

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত

আমার প্রথম পরিচয় ঘটে,

সহোদরাধিক স্নেহে যে ঋত্বিক্ আমাকে সাহিত্য-সাধনার

প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দেন,

রামেন্দ্রসুন্দরের সহযোগিরূপে যিনি পরিষদের

প্রতিষ্ঠা, অভ্যুদয়, বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্য

অসঙ্কোচে আত্মবলি দিয়া গিয়াছেন,

আমার সেই অগ্রজকল্প পূজনীয়

ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয়ের

উদ্দেশে

তাঁহারি প্রিয় রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত-কথা

অর্পণ করিলাম।

নিবেদন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সন্দর্ভগুলি বাহির হয়, সেইগুলি ও আরও কয়েক জন মনীষীর দ্বারা আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখাইয়া লইয়া "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্প করি। আমার এই সঙ্কল্পের কথা প্রথমেই আমি পূজনীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (যিনি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক) দাদা মহাশয়ের কাছে জানাই। আমার কথা শুনিয়া তিনি আমায় বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং বলেন—"কাজটা করিয়া তুলিতে পারিলে, রামেন্দ্র-স্মৃতির একটি সুন্দর নিদর্শন ও বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্পদ্ সংরক্ষণের উপায় হইবে।"

তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কথা কয়টা বাহির হইল, তাহা সহজে হজম করিতে না পারিয়া আমি ভক্তিভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। তিনিও ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন,—"এগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদন করে বের কর্‌তে পার্‌লে খুব একটা ভাল কাজ হয়। আর এটার প্রকাশ দ্বারা রামেন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার কাজটাকেও এগিয়ে দেওয়া হবে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটি আমায় প্রকাশের অনুমতি দিলেন।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধটিকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য প্রবন্ধ-লেখকগণের নিকট গমন করিলাম, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের লিখিত

প্রবন্ধগুলিও আমার সম্পাদিত এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। এই প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ব্যতীত আরও অনেক মনীষীকে রামেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়া দিবার জন্য ধরিলাম, দুই একজন ব্যতীত তাঁহাদের প্রায় সকলেই আমার নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। তবে তাঁহাদের লেখাগুলি সময়মত না পাওয়ায়, ঐগুলি ঠিকমত সাজাইতে পারিলাম না। তিন চারি জনের লেখা এত শেষাশেষি পাইলাম যে, তাড়াতাড়ি পুস্তক বাহির করার হাঙ্গামায় ঐগুলিতে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল। যদি কখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, সে সময়ে এ সমস্ত ত্রুটি শোধরাইবার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি এবং যাঁহারা এই গ্রন্থের জন্য নূতন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যেই আজ আমি পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে সমর্থ হইলাম।

সকলের লিখিত প্রবন্ধের শেষে "রামেন্দ্র-কথা" নাম দিয়া আমি রামেন্দ্র বাবুর জীবন-কথা ও তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপকরণ ও সময়াভাব হেতু ইহার মধ্যেও অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

আমার স্নেহাস্পদ ও কল্যাণীয় বন্ধু কুমার শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার পূজনীয় পিতা মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা বাহাদুরের নামে যে "হৃষীকেশ-সিরিজ" বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানিকে সেই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে মনোনীত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

চিত্রাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া এরূপভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি সমর্থ হইতাম না, যদি শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ, পূজনীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র দাদা ও রামেন্দ্র-শিষ্য, উদার-হৃদয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ ইহার জন্য অর্থ সাহায্য না করিতেন। এই সাহায্যের জন্য আমি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের কাছে ইঁহাদের মঙ্গল কামনা করি।

এতদ্ব্যতীত আমার অনেক বন্ধু ও রামেন্দ্র-গুণানুরাগী ব্যক্তি এই গ্রন্থ-প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

৺রামেন্দ্রবাবুর পত্নী মহোদয়া এই গ্রন্থে তাঁহার পূজনীয় স্বামীর লিখিত "সাহিত্য-সম্মিলন" নামক প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়গণ ব্লক ও বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় যদি শেষ রক্ষা না করিতেন তবে বোধ হয় আমার দ্বারা এ কার্য্য শেষ হওয়া কঠিন হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রুফাদি সংশোধন-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের সকলের নিকটে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার নিজের অনিচ্ছাকৃত শত ত্রুটী সত্ত্বেও, বিভিন্ন মনীষী কর্ত্তৃক লিখিত রামেন্দ্র-কথা যদি কোন রামেন্দ্র-ভক্তের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তবে আমার সমস্ত শ্রম সফলজ্ঞান করিব।

মহালয়া
২৫শে আশ্বিন, ১৩২৭
কলিকাতা।

নিবেদক
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট—

চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

পরিষদ্-সম্পাদক—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ও তাঁহার অক্লান্তকর্ম্মী সহকারী

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতকে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অজেয়বীর্য্য দ্বারা জড়কে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, ধৈর্য্যের দ্বারা অসাধ্যকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা সকলকে আপন করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ই ভাদ্র ১৩২১

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

(১)

লেখক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রামেন্দ্র বাবু এত অল্প দিন হইল আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন যে, তিনি যে আর আমাদের মধ্যে নাই, এ কথা এখনও আমরা ধারণা করিতে পারিতেছি না। এখনও যেন মনে হইতেছে, তিনি রোগশয্যায় শুইয়া আছেন; এখনও যেন আশা হইতেছে, তিনি আবার সারিয়া উঠিয়া তাঁহার এই প্রিয় সাহিত্যপরিষদ্-মন্দিরে আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। আমার এই ভ্রম কিন্তু ক্রমে ক্রমে বড় কষ্ট দিয়া ঘুচিতেছে। আমার নিজের পড়ার ঘর হইতে তাঁহার পড়ার ঘর দেখা যায়। ভ্রমবশতঃ, পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ যেমন দিন রাত্রে পাঁচ বার দশ বার তাঁহার বাড়ী যাইতাম, এখনও সেইরূপ যাইবার জন্য দুই তিন বার উঠিয়াছি, এবং তিনি আর নাই, এই কথা মনে পড়ায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িয়াছি; পাঁচ বৎসর সত্য সত্যই আমরা পরমানন্দে ছিলাম। সাহিত্য-সংসারে, সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে, আমরা সর্ব্বদাই মিলিত হইতাম। যে কোনও অবস্থায় রামেন্দ্র মন খুলিয়া আমাকে পরামর্শ দিত, উপদেশ দিত, সে আমাকে কতই ভক্তি করিত, ভালবাসিত। শেষ তাহার পরিবারবর্গের মুখে শুনিলাম যে, সে আমারই জন্য পটলডাঙ্গায় বাসা করিয়াছিল এবং নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে এখান হইতে যাইতে চাহে নাই। এ কথা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বটে;

কিন্তু সে শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিব কাহার কাছে ? সে ত আর ধরাধামে নাই।

শোক পবিত্র। শোক নির্ম্মল। শোকে মানুষকে নির্ম্মল করে। শোকে মনের অনেক মলা কাটিয়া যায়। কিন্তু শোক লইয়া ত মানুষে থাকিতে পারে না। শোক চাপা দিয়া আবার তাহাকে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকল কার্য্যই করিতে হয়। আজি এ সভায়—এ পবিত্র শোকসভায়—একটি কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি; আসিয়াছি প্রকাশ্যভাবে রামেন্দ্রের জন্য শোক করিতে, নিজের মন প্রবোধ মানুক আর না মানুক, তাঁহার পরিবার-বর্গকে প্রবোধ দিতে, হয় ত তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতে। এ কর্ত্তব্য কঠোর বলিতেছি কেন ? যে হেতু এ সব প্রকাশ্য ভাবে করিতে হইতেছে।

এ সভার উদ্বোধনে রামেন্দ্র সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে হয়। আমি তাহা পারিব না। আমি বক্তৃতায় এখনও এত অভ্যস্ত হই নাই যে, মনের আবেগ সংবরণ করিয়া বক্তৃতা করিয়া যাইব। সেই জন্য আমি মনে করিতেছি, রামেন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তাঁহার বংশের কথা কিছু বলিয়া যাইব। রামেন্দ্রের চরিত্রে এমন অনেকগুলি বৈচিত্র্য ছিল, যে সব তাঁহারই বংশে সম্ভব, ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। একটা প্রবাদ আছে—'বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ্ নহী, তব্ বী থোড়া'—ইহা কত দূর সত্য, তাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

G. I. P. ও E. I. R. এই দুইটি রেল সংযোগ করিয়া ঝাঁসী হইতে মাণিকপুর পর্য্যন্ত যে একটি রেলপথ আছে, তাহার ঠিক মাঝখানে হরপালপুর নামে ষ্টেশন—সে ষ্টেশন হইতে ঝট্‌কায় চড়িয়া দক্ষিণ দিকে ৮৫ মাইল যাইলে খাজুরাহা বলিয়া একটি প্রাচীন নগর পাওয়া যায়। দেশের লোকে উহা অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করে। এই জন্য উহার নাম রাখিয়াছে—'পুরী'। 'পুরী'র মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়; দুই দিক্ পাথরের পোস্তা দিয়া

গাঁথা ; অপর দুই দিক্ দিয়া গড়াইয়া জল আসে। এই পুকুরের ধারেই রাজবাড়ী, রাজবাড়ীর পিছনে অনেকগুলি মন্দির। কতকগুলি মন্দির খুব মেরামত করা, তাহাতে এখনকার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। যেগুলি মেরামত হয় নাই, সেগুলি নানা অবস্থায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। সেখান হইতে পোয়াটাক পথ দূরে আবার কতকগুলি মন্দির, কতক মেরামত, কতক বেমেরামত, সেগুলি জৈনদিগের। আরও কতকগুলি মন্দির—সব বেমেরামত—বৌদ্ধদিগের। এখানকার মন্দিরের একটু বৈচিত্র্য আছে। মন্দিরের সকল দেওয়াল হইতে পুত্তলী বাহির হইতেছে। পুতুলগুলি উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত এক এক সারিতে গাঁথা। ভিতরেও তাই, বাহিরেও তাই। দেখিতে মন্দিরগুলি অতি সুন্দর। এরূপ পুতুল বা'র করা মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। বিন্ধ্য পর্ব্বতের বিশাল উদরে ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট ডেলা, ছোট ছোট ডুংরি, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট হ্রদ, ছোট ছোট ঝরণা, এই সব বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে খাজুরা নগরের বিচিত্র মন্দিরগুলি আরও বিচিত্র দেখায়। দেশটিও বিচিত্র। গ্রামগুলিতে বসতি বিরল। বন ঘন। বসন্তে যখন বনময় পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠে, বোধ হয় যেন পৃথিবী একখানি রাঙ্গা চেলী পড়িয়া বৌ সাজিয়াছেন। এই উঁচু নীচু, পাহাড়-বন-নদীর উপর রাত্রিতে যখন জ্যোৎস্না পড়ে, তখন যে আলো-আঁধারের খেলা হয়, সে আরও বিচিত্র। হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতির এই প্রিয় ভূমির মধ্যে দুইটি জাতি উঠিয়াছিল—একটি ব্রাহ্মণ, জিঝোটিয়া ; আর একটি ক্ষত্রিয়, চাণ্ডেল। জিঝোটিয়ারা কুমারিলের সময়ে যজ্ঞ করিতে এই দেশে আসিয়াছিলেন—দেশটির নাম জেজাভুক্তি, চলিত ভাষায় জেঝৌটি ; ব্রাহ্মণদের নাম জেজাভুক্তীয়, বা জিঝোটিয়া। জিঝোটিয়ার মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় কবি, বড় বড় যোগী, বড় বড় শাসনকর্ত্তা রাজমন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন।

জিঝোটিয়ারা বড় 'ঘরবোলা'—আপনার ঘর ছাড়িয়া বড় একটা যাইতেই চাহে না। রামেন্দ্র বাবু ১৮৭১ সালের সেন্সস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন যে, জিঝৌটি বা বুন্দেলখণ্ডে হামীরপুর, ঝাঁসি, জালোন, ললিতপুর—এই কয় জেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ আছেন; কিন্তু ইহার বাহিরে পাঁচ হাজারও পাওয়া যায় না। একবার কেবল, শেরশা কালিঞ্জরের চাণ্ডেল-বংশ ধ্বংস করিয়া দিলে, দুই চারি ঘর বড় বড় জিঝোটিয়া ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মধ্যে এক ঘর মানসিংহের সঙ্গে জুটিয়া বাঙ্গালা দখল করিতে আসেন, এবং মানসিংহের কাছে ফতেসিং পরগণা জায়গীর পান। বাঙ্গালার জিঝোটিয়ারা আবার তেমনই 'ঘরবোলা' হইয়া যান। তাঁহাদের মুখে এই তিন চারি শত বৎসর কেবল 'ফতেসিং' আর 'ফতেসিং'—বাঙ্গালায় যে আর সব দেশ আছে, আর আর জেলা আছে, আর আর নগর আছে, তাঁহাদের কাছে সেগুলি কিছুই নয়—সব ফাঁকা। চারি শত বৎসর ধরিয়া একটি জমীদারী এক পরিবারের হাতে প্রায়ই থাকে না। ফতেসিংএর অধিকাংশ জিঝোটিয়াদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা সেই 'ফতেসিং'ই ধরিয়া আছে। যে সকল জিঝোটিয়ারা অল্পবিস্তর জমী জমীদারী ভোগ করিতেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন।

তিনিও বড়ই 'ঘরবোলা' ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে তিনি একবার পুরী গিয়াছিলেন, আর একবার সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস দেখিবার জন্য বক্সারে গিয়াছিলেন। আর তীর্থ করিতে তিনি একবার গয়া আর একবার কাশী গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যেও জেমো আর কলিকাতা, কলিকাতা আর জেমো। কেবল তাঁহার সাধের সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য কয়েকবার এ জেলা ও জেলা বেড়াইয়াছিলেন। এই 'ঘরবোলা' ভাব—তিনি তাঁহার বংশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

তিনি জিঝোটিয়াদের আরও একটি ভাব পাইয়াছিলেন। তাঁহার খুব

পড়াশুনা থাকিলেও সে জন্য তাঁহার গুমর ছিল না, বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন না। জিঝোটিয়াদের মধ্যে পূর্ব্বেও অনেক অনেক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, এখনও আছেন। আমি দুই চারি জন জিঝোটিয়া পণ্ডিত দেখিয়াছি। তাঁহারা সে কালের ধরণে খুব পণ্ডিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার তাঁহাদের কোনই চেষ্টা নাই। জিঝোটিয়াদের বড় গৌরবের দিনে, কৃষ্ণমিশ্র নামে এক প্রগাঢ় দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি করিয়াছেন কি? লিখিয়াছিলেন এক নাটক, তাহার নাম প্রবোধচন্দ্রোদয়। যে কেহ সে নাটক পড়িয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, কৃষ্ণমিশ্র কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দার্শনিক ছিলেন, তা' নয়; সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, লোকচরিত্র বেশ বুঝিতেন। রামেন্দ্র বাবুও তেমনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কতই পড়িয়াছিলেন; যাহাই পড়িয়াছিলেন, তাহাই হজম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন কি? মাসিকপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বই। এই যে বিদ্যাপ্রকাশে উদাস ভাব, তাহাও তিনি জিঝোটিয়াদের নিকট পাইয়াছেন।

রামেন্দ্রবাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে কথা খুব সত্য। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, হিংসা, বিদ্বেষ—এগুলি তাঁহার ছিল না। এটিও তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট পাইয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়েরা বহুকাল ধরিয়া ফতেসিংএ বাস করিতেছিলেন। ফতেসিংএর জমীদারেরা অনেক সময় ঝগড়া, বিবাদ, মোকদ্দমা, মামলা করিতেন—কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়েরা ঝগড়া মিটাইবার চেষ্টা করিতেন, উস্কাইয়া দিতেন না। তাঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রবাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, 'আমারও অল্প বয়সেই মৃত্যু হইবে।' তিনি অনেকবার বলিয়াছেন—'পিতা পিতামহের তুলনায় আমি ত দীর্ঘজীবী।' তিনি যে এত উদার, এত ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার কারণ তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে ভাবিতেন—

'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা।' আমি একটা জিনিস বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, যখন তাঁহাকে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তিনি যেন তখন বেশী বেশী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক একবার মনে হইত, তিনি জাঁক ধড় ভালবাসিতেন। আর জেঁকো লোকের উপর সকলেরই কেমন অশ্রদ্ধা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রামেন্দ্রের কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, তাঁহার এই আনন্দের মধ্যে জাঁক নাই। 'বাপ পিতামহের চেয়ে অনেক দিন বাঁচিয়া আছি' ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ। সে আনন্দের ভিতরেও তিনি 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা—'।

রামেন্দ্র বাবু বড় কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। অল্পেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। ইহারও প্রধান কারণ এই—তিনি পুরুষের নিকট শিক্ষা পান নাই, শিক্ষা পাইয়াছিলেন স্ত্রীলোকের নিকট। বাপ দাদার চেয়ে মা ও ঠাকুরমাই তাঁহাকে বেশী শিক্ষা দিয়াছেন। আর তিনি যে সকল স্ত্রীলোকের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বড় ঘরের মেয়ে। বড় ঘরের মেয়ে হইলেই একটু উদার হইবে, একটু ধর্ম্মভীরু হইবে।

তাঁহার হৃদয় কত কোমল ছিল, তাহা আমরা একবার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মারা গেলে, রামেন্দ্র বাবু সে সময় অত্যন্ত পীড়িত ও কাতর হইলেও বিশেষ আগ্রহ করিয়া উঁহার শোক-সভায় প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। সেরূপ প্রবন্ধ রামেন্দ্র বাবুই লিখিতে পারিতেন। প্রাণ খুলিয়া তিনি আপন প্রীতিপাত্রের কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। এবং উহা পড়িতে পড়িতে সভাস্থলে দুই তিনবার কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল—ব্যোমকেশের স্মৃতির সহিত তাঁহার নাম জড়িত থাকে। তাই আমরা, এই প্রবন্ধের মুখপত্রে, তাঁহার প্রিয় সহচর ব্যোমকেশের সহিত তাঁহার প্রতিকৃতি দিলাম।

বিদ্যার উপর রামেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই পড়িতেন, নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। তাই তিনি অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। ইহারও মূলে দেখিতে পাই এই যে, বাঙ্গালায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বচ্ছন্দেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; অন্নচিন্তা তাঁহাদের একেবারেই ছিল না। অল্পবিস্তর লেখাপড়া সকলেই শিখিতেন। পরস্পরের উপর তাঁহাদের খুব আত্মীয় ভাব ছিল, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের উপর এত আত্মীয়তা। তাঁহারা লেখাপড়া করিয়াই দিন কাটাইতেন। তাঁহার পিতা পিতামহেরাও লেখাপড়া খুব করিতেন; কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ বা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। অল্পবিস্তর যে জমীদারী ছিল, তাহা সুশাসনে রাখা, আর লেখাপড়া করা—সেই তাঁহাদের ব্রত ছিল। তাঁহাদের ব্রত তাঁহারা রামেন্দ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। রামেন্দ্র তাঁহাদের চেয়ে বেশী কাল বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেয়ে বেশী কৃতিত্বও দেখাইয়া গেলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব জেমোর সমাজে আবদ্ধ; রামেন্দ্রের কৃতিত্বে সারা বাঙ্গালা মুগ্ধ।

রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য-পরিষদের মন্দির। ছেলেবেলায় যাহা দেখে, লোকে বড় হইলে তাই করিতে চেষ্টা করে। রামেন্দ্র বাবু ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলেন, কাঁদির ডিস্পেন্সরি লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মেকেঞ্জীর সহিত জেমোর রাজার ঘোরতর বিবাদ হয়, এবং সে বিবাদে জেমোর রাজারই জয় হয়। মেকেঞ্জী লিখিয়া যান, 'বাবু নরেন্দ্রনারায়ণকে লোকে রাজা বলিয়া থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজোপাধির যোগ্য।' কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ, প্রজারা তাঁহাকে রাজা বলে, ইহাতেই খুসী ছিলেন, তিনি রাজোপাধির জন্য কখনও ব্যস্ত হন নাই। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনারায়ণের কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া ও শুনিয়া

রামেন্দ্রেরও সেইরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি হয়। নরেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টা জেমোতেই আবদ্ধ, রামেন্দ্রের চেষ্টায় সারা বাঙ্গালা, এমন কি, সারা ভারত উপকৃত।

রামেন্দ্র উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বংশেরই অনুযায়ী ছিল। তবে কি তাঁহার নিজের কিছুই কৃতিত্ব নাই? বংশ হইতে আমরা কি পাই? বীজ পাই। বিদ্যার উপর, সৎকর্ম্মের উপর অনুরাগ—এ সকল বংশ হইতে পাই। কিন্তু সে বীজকে অঙ্কুরিত করে কে? ফল-পুষ্পে শোভিত করে কে? সে ত নিজের চেষ্টা। রামেন্দ্র যদি নিজের চেষ্টায় ভাল করিয়া পরীক্ষা পাশ না করিতেন, তবে কাঁদি স্কুল হইতে পাশ করা শত শত ছেলের মত তাঁহারও চেষ্টা স্বগ্রামেই আবদ্ধ থাকিত। তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার সময়ের অনেক লোক ত এমন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মত সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিলেন; করিয়া 'যেন মে পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ' সেই পথেরই অনুসরণ করিলেন।

অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য—যে দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাথামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরী'ই বল, 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ'ই বল, আর যে কোনও প্রসঙ্গই বল, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন:—"পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী এক জন কাব্যামোদী লোক ছিলেন। 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও

'স্বর্ণসিন্দূর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একখানি প্রহসন বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছেন। পৌরাণিক শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বহু ব্যয়ে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ, উপপুরাণ আদির হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, স্বয়ং নিয়মিতরূপে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতেন।" আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—"বাবা একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসের নাম দিয়াছিলেন—'বঙ্গবালা'। কয়েক ছত্র পয়ারে উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। উহার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না!
বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর-ঘোষণা॥
রণক্ষেত্রে বীরমদে মত্ত হতজ্ঞান।
হয় নাই বহু দিন বাঙ্গালীসন্তান॥
এবে বঙ্গজনস্থান নিস্তব্ধ নীরব।
কোন দিকে নাহি আর কোন কলরব॥
রাজনীতি-আলোচনা দুরূহ ভাবনা।
রাজ্যরক্ষা হেতু চিন্তা সাম্রাজ্য বাসনা॥
এ সকল কষ্টকর কার্য্যে বাঙ্গালীরে।
প্রবৃত্ত হইতে আর না হয় সংসারে॥"

রামেন্দ্রবাবুর বাবা জেমোয় একটি থিয়েটার করেন; অনেক খরচ করিয়া তাহার সাজ সরঞ্জাম করেন; 'বেণীসংহার', 'অশ্রুমতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় হয়। তিনি নিজে 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একখানি ছোট নাটক লিখিয়া অভিনয় করেন। অভিমন্যুবধ অবলম্বন করিয়া আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানির আর অভিনয় হয় নাই।

এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যকাল কাব্য-

চর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্য্যেই, সকল লেখায়ই, সকল বক্তৃতায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

লোকে বলে, রামেন্দ্র বাবু Nationalist ছিলেন। এ দেশহিতৈষিতা তিনি নেতাদের নিকট পান নাই। কারণ, নেতাদের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না। কলেজ, ঘর আর সাহিত্য-পরিষদ, এই তাঁহার স্থান ছিল। সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার এই বীজ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। আমরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। "বঙ্গবালা" উপন্যাসের ভূমিকার কয়েকটি ছত্র তুলিয়া রামেন্দ্র বাবু বলিতেছেন :—

"এই উক্তি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছিল। স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষণ ঘটিত। স্বভাব-প্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।"

রামেন্দ্র বাবু জানিতেন যে, তিনি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের মত কার্য্য না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। তাঁহার বাপ-দাদা দেবতার মত লোক ছিলেন, তিনিও দেবতার মত হইবার চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি এত লোকের ভক্তির ও স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলাম,—"বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুচ নহী, তব্‌ভী থোড়া।'

——o——

৺রামেন্দ্রসুন্দর (যৌবনে)

(১৮৯১ সালে গৃহীত ফটো হইতে)

(২)

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় মনীষী, মনস্বী, যশস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মার মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল! দেশবাসীর মনে শোকের অন্ধকার; সাহিত্যের তপোবনে বিষাদের ছায়া। সাহিত্য-দেবতার পবিত্র মন্দিরে যে কয়টি দীপে পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আমরা মায়ের আরতি করিতাম, সেই পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল মধ্য-দীপ রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার সারস্বত মন্দির অন্ধকার করিয়া অকালে আলোর সাগরে অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য শোচনীয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বাঙ্গালার ও সমগ্র বাঙ্গালীর আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যে কয় জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। আমার প্রথম পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। জীবন-প্রভাতে যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি আমার অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে হারাইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।

রামেন্দ্রসুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

আমার মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে কালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল। ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণে'র কল্যাণকামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনও অসংযম, কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের মত বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজস্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্ম-সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদূত। নিজত্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন

হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে 'গোঁড়ামী'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষাবিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে। সংক্ষেপে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম বহুদিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্দ্র-সুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরস ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন; তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সকল কর্ম্মের মূল—দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ্-মন্দিরের ইঁটের পর ইঁট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাঁহার দেশাত্ম-বোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,—'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!' তিনি তাঁহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙ্গালীর ভাগ্যেও নিষ্ফল হইতে পারে?

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান,—এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা জলে,' রামেন্দ্র-সুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী, চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি তুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যা-খ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা

দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন,—'ইংরাজী রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাহার সূচনা করিয়া বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিষ্ক্রয়ে বাঙ্গালীকে তাহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'যজ্ঞ' শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরস্মরণীয় নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতার জয়স্তম্ভ বটে। রামেন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি,—
'নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কর্ম্মী ছিলেন ; এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কর্ম্মীদিগকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রস্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাঙ্গালার পূজায় মজিয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি অনেক শক্তিশালী লেখককে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তর-জীবনে দর্শন, উপনিষদ্, বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ে আমি তাঁহাকে সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে—

'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।'

লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে 'এসিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্ত-লোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েক দিন পূর্ব্বে "নাইট" উপাধি বর্জ্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্র বাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্র বাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত

হন। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে রবি বাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্র-সুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্র-সুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের এক-মাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক।

---

(৩)

লেখক

মাননীয় মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই

রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের মুর্শিদাবাদের ;—যৌবনের প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরকে জানিতাম। যখন তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে আলাপ হইত, তখনই কত নূতন কথা, কত নূতন ভাবের কথা শুনিতাম। রামেন্দ্রসুন্দর কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন ; আজকাল একত্র এতগুলি গুণের সমাবেশ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি কখনও রামেন্দ্রসুন্দরকে কাহারও নিন্দা করিতে শুনি নাই। তিনি দলাদলির আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। ঘোর তর্ক-বিতর্কে, ঘোর অত্যাচার-উপদ্রবেও আমি কখনও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই। বাস্তবিকই রামেন্দ্রসুন্দর এই নরলোকের দেবতা ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুরের নিকট পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে টেঁয়া বৈদ্যপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। ন্যূনাধিক ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুনগোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়নাথ এই গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র, জেমো রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া, জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর ; কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ; এই গোবিন্দসুন্দরই আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুত্রদিগকে সুশিক্ষিত করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হাতে-খড়ির পর রামেন্দ্রসুন্দর গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার জন্য কাঁদি রাজ-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, ইংরাজী স্কুলে পড়িবার সময়ে তিনি বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি মাসিক ২৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার বিদ্যোৎসাহী পিতা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু দিন পূর্ব্বে পরলোকগমন করায়, পুত্রের পরীক্ষার সর্ব্বোত্তম ফল জানিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বি এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲টাকা বৃত্তি পান। বি এ পড়িবার সময় তিনি 'নবজীবনে' বেনামীতে প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। 'নবজীবনে'র সম্পাদক স্বর্গীয় ভাষা-পণ্ডিত সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহাকে উৎসাহ দেন। তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎপর বৎসরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদ-ত্যাগের পর তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৩০১ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। যাঁহাদের উদ্যোগে এই পরিষৎ স্থাপিত হয়, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পরিষদের স্থাপনাবধি তাঁহার সহিত পরিষদের সম্বন্ধ। তিনি একজন সাহিত্য-নায়ক ছিলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ-

পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে তিনি আনন্দিত ও দুর্গতিতে ক্ষুব্ধ হইতেন; তাহার মঙ্গলবিধানের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরিষদ্‌গতপ্রাণ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহকারিত্বে তাঁহার অদম্য উৎসাহের ফল,—সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান এতাদৃশী উন্নতি। যত দিন সাহিত্য-পরিষৎ থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের আর পৃথক্ স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিতে হইবে না। সাহিত্য-পরিষৎই রামেন্দ্রসুন্দরের জড় মূর্ত্তি।

রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টায়, আমার ক্ষীণ যত্নে ও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন হয়। তৎপরে অদ্যাবধি বৎসরের পর বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম সম্মিলনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

এমন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের সেই পুরাতন শান্ত তপোবনের ঋষিদের কথা মনে পড়িত। পাণ্ডিত্যাভিমান তাঁহার আদৌ ছিল না।

প্রকৃতির রহস্য সরল বাঙ্গালায় তিনি যেমন বুঝাইতেন, তেমনটি পুর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। সম্প্রতি তিনি দুর্ব্বোধ্য বৈদান্তিক তত্ত্বগুলি সোজা কথায় বলিতে আরম্ভ করয়াছিলেন। সেগুলির শেষ হইতে না হইতে তিনি আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উপর তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বদেশ-ব্রত আদর্শ ব্রাহ্মণ ও উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে ভালবাসিতেন না, কিন্তু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে তিনি অরন্ধনের প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন ও 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিয়া-

ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম্মকথা', 'চরিতকথা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সর্ব্বজনপ্রিয় ও জ্ঞানগর্ভ।

যিনিই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার অমূল্য নিধি। আজ আমরা এই দুর্দ্দিনে সেই নিধি-হারা হইলাম!

---

(৪)

লেখক

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া। সে আজ প্রায় ২৪ বৎসরের কথা। তখনও রামেন্দ্র বাবু পরিষদে সম্পূর্ণ ধরা দেন নাই। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তখন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিবেশিত্ব ও বন্ধুত্ব-নিবন্ধন রামেন্দ্র বাবু প্রথমে সাহিত্য-পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। তখনও পরিষৎ শিশু; রামেন্দ্র বাবুর ধাত্রীত্বগুণে এই শিশু যে, অচিরকাল মধ্যে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইবে, তাহা তখনও অনেকে নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই প্রথম পরিচয়ের পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর নামের সহিত আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলাম, তখনই রামেন্দ্র বাবুর খ্যাতির সহিত পরিচিত হই। কারণ সে সময়ে ছাত্রমহলে প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া রামেন্দ্র বাবুর যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেকানেক ছাত্র তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও বিজ্ঞান-তত্ত্ব ব্যাখ্যানে উপকৃত হইয়া তাঁহার যশোগান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তখনও আমি তাঁহার নিকটস্থ হই নাই; দূর হইতে তাঁহার উদীয়মান দীপ্তি-ভাতির প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। সেই সময় সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল।

প্রথমেই তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও অমায়িক স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করিল। একটু নিকট-পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে, তিনি শুধু আমার প্রিয় নহেন— সর্ব্বজনপ্রিয়। অজাত-শত্রু হওয়া বোধ হয় এ যুগে দুরূহ; কিন্তু দেখিলাম যে, যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিতে পারা যায়, ত্রিবেদী মহাশয়ের সেই সকল গুণ প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে। আর সে জন্য তাঁহার আন্তরিক সুহৃদ্ (কেবল মৌখিক বন্ধু নহেন) অনেকেই ছিলেন।

আরও একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইলে দেখিলাম, যদিও ত্রিবেদী মহাশয় রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত নহেন, তাঁহার হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে মাতোয়ারা; দেখিলাম ;—তিনি শুধু দেশের কথা ভাবেন না, দেশের কথা জানেন এবং দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায় মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করেন। শুনিয়াছি, তাঁহার চেতন-জীবনের শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত দেশের ভাবনাতেই নিয়োজিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ ত্রিবেদী মহাশয়ের "জিজ্ঞাসা", "প্রকৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। বন্ধু বলিয়া তিনি ঐ সকল গ্রন্থ আমায় উপহার দিলেন। সযত্নে পাঠ করিলাম, দেখিলাম রামেন্দ্র বাবু শুধু প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিক নহেন, দর্শন-ক্ষেত্রেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা এবং সাহিত্যের উপরও তাঁহার প্রবল অধিকার। একাধারে তিনি যে কৃতী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক শুধু তাহাই নহে, ত্রিবেদী মহাশয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে দর্শন-বিজ্ঞানের ব্যোম-বিহারী সুপর্ণকে আমাদের এই পৃথিবীর মাটীতে নামাইয়া আনিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় সুপাঠ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি ঘরে ঘরে বিজ্ঞান-সুধা বিতরণ করিয়াছেন। সেই জন্য বঙ্গবাসীমাত্রেই চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

জীবনের শেষ দশ বৎসর ত্রিবেদী মহাশয় বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইলেও এ বিভাগ তখন তাঁহার নিকট নূতন ক্ষেত্র ছিল; কিন্তু বন্ধুর ভূমিতে রথ্যা-রচনার সাহস ও উৎসাহ তাঁহাতে পূর্ণ

মাত্রায় ছিল। সেই জন্য ঐ বয়সেও তিনি বৈদিক সাহিত্যে বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তাহার ফলে, তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রকাশ করেন; এবং গত ১৩২৫ সালে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য-পূর্ণ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ সকল প্রবন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও উদার বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষদের সহিত ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিচয়-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া অবশেষে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠেন। এমন সর্ব্বংসহা সর্ব্বমুখী সেবক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষদের সর্ব্ববিধ কার্য্যে রামেন্দ্র বাবু অকৃত্রিম সুহৃদের কার্য্য করিতেন এবং অধিকাংশ সময় পরিষদের কার্য্যে ব্যয়িত করিতেন।

রামেন্দ্র বাবুর অনুবাদিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, এই বিশাল বিচিত্র সৃষ্টি প্রজাপতির বিরাট্ আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাপতি আত্মবলি দিয়াছিলেন বলিয়াই এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবন-ব্রতের মধ্যেও ঐ জাতীয় আত্মত্যাগের আমরা নিদর্শন পাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্য নিজেকে বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিশাল আত্মত্যাগের উপরই পরিষদের অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠিত। রামেন্দ্রসুন্দর যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া, একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পরিষদের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষদের এত সমৃদ্ধি ও সার্থকতা, এত প্রসার ও প্রতিপত্তি, ইহার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের বিপুল আত্মত্যাগ।

আর এক কথা। শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা মৎস্য অবতারের যে আখ্যান পাঠ করি, ত্রিবেদী মহাশয় সেই আখ্যানের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনে তাহাকে আকৃতি দান করিয়াছিলেন। সে আখ্যান পাঠে আমরা অবগত হই, এক দিন ভগবান্ বৈবস্বত মনু এক নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন

সময় এক স্বল্পকায় মৎস্য আসিয়া তাঁহার দেহলগ্ন হইল। মনু গণ্ডূষে জল ভরিয়া সে মৎস্যকে উঠাইয়া লইলেন এবং গৃহে যাইয়া এক অপরিসর মৃৎপাত্রে তাহাকে রক্ষা করিলেন। মৎস্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আর সে মৃৎপাত্রে তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তখন বৈবস্বত মনু তাহাকে প্রথমে একটি জলাশয়ে রাখিলেন। সেখানেও স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, পরে এক নদীতে রাখিলেন। এখানেও যখন স্থান অকুলান হইল, তখন তাহাকে মহা-সমুদ্রে রক্ষা করিলেন। এইবার প্রলয়-প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইল। তখন বৈবস্বত মনু এক পোতারোহণ করিয়া, তাহার বন্ধন-রজ্জু সেই তিমিঙ্গিল মৎস্যের বৃহৎ শৃঙ্গে সংযুক্ত করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরও বুঝিয়াছিলেন যে, এই যে আমাদের বঙ্গবাণী, ইহা তুচ্ছ নহে, নগণ্য নহে ; সেই জন্য তিনি ইহাকে সযত্নে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ ইহার পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্লাবন আসিতেছে, যাহার আক্রমণে আমাদের বিলোড়িত, বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা, সেই প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকেও জাতীয় জীবন-তরী বঙ্গবাণীর সমৃদ্ধ মহিমার শৃঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। তবেই আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব, তবেই আমরা জাতীয় জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইব, তবেই আমরা রামেন্দ্র-সুন্দরের আমরণ-আচরিত ব্রতের সার্থকতা সাধন করিব।

———

(৫)

লেখক—শ্রীযুক্ত আর কিমুরা

আজ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে দুটো কথা বলিব। আপনারা হয়ত প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, তুমি বিজাতি, বিদেশী, তোমার এই স্মৃতি-সভায় দুটো কথা বলিবার কি অধিকার আছে? তুমি বলিবার কে? কিন্তু যে মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থ আজ আপনারা এই বিরাট সভা আহূত করিয়াছেন, যাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভকে উন্নততর করিবার জন্য আপনারা প্রয়াস করিতেছেন, তাঁর সহিত আমার যে কতদূর গাঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা আপনারা জানেন না। আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুটো কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। তাঁর সহিত আমার সম্বন্ধ—তিনি প্রথমতঃ আমার শিক্ষাদাতা, এবং দ্বিতীয়তঃ আমার শাস্তিদাতা।

প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সানুগ্রহে আমাকে স্বনামখ্যাত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া আমার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়—কি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়াছি—কি প্রশান্ত নয়ন, কি গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী—এমন আশা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছিলাম, বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, প্রথম দিনেই নয়ন সার্থক হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, তখন আমি বাঙ্গালাও ভাল জানিতাম না, ইংরাজীও সেইরূপ। মনের আশা মিটাইয়া—প্রাণ খুলিয়া—তাঁর সহিত দুটো কথা সে দিন আর বলিতে পারিলাম না। তাঁর কথাগুলিও বড় ভাল বুঝিতেও পারিলাম না। সেই অবধিই মাঝে মাঝে আমি তাঁর কাছে

যাইতাম—নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁকে উত্যক্তও করিতাম, কখনও সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে, কখনও বা হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে, কখনও বা তন্ত্র সম্বন্ধে, এবং কখনও বা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোনটির উত্তর না দিয়া বলিতেন—'আমি ও সম্বন্ধে জানি না।' কি আশ্চর্য্য!—এমন পণ্ডিত, লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম তাঁর মত পণ্ডিত খুব কম, এবং নিজেও কত আশা করিয়া তাঁর কাছে আসিয়াছিলাম, তিনি নিজেই বলিলেন—'আমি ও সম্বন্ধে জানি না।' সেই দিন হইতেই আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া তাঁর পাণ্ডিত্যে আমার খুব সন্দেহ হইয়াছিল। আর আমি তাঁর কাছে বড় যাইতাম না—এমন কি, এক বছর ধরিয়া যাই নাই।

হঠাৎ এক দিন মনে হইল, আজ ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট গিয়া একটু গল্প করিয়া আসি। ধীরে ধীরে তাঁর বাইরের ঘরে গেলাম। তিনি বড়ই যত্ন করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। অনেক কথার পর বৈদিক যজ্ঞের কথা উঠিল,—সেই সময়ে আমি যজ্ঞ সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনা করিতেছিলাম। কিন্তু কোনরূপে ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে, যজ্ঞ বলিতে অনেক যজ্ঞ বুঝায়। সত্য কথা বলিতে গেলে, সেগুলি না দেখিলে বুঝা বড় শক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ভারত তা'র পূর্ব্বের সে পথ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পিতৃপিতামহের কর্ম্মকাণ্ড—যজ্ঞ, সে আর করিতে জানে না। তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে বিষয়ে এখন শিক্ষা বা অনুসন্ধান করিতে গেলে, সেই বিষয়ের পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দরও এক জন সেই ধরণের পণ্ডিত ছিলেন। অনেক পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু বিজাতি বলিয়া কেহই আমাকে তাহা শিখাইতে প্রতিশ্রুত হন নাই, কিন্তু সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে সে আশা মিটিয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছে আমার কষ্টের কথা জানাইয়াছিলাম—অনেক দিন ধরিয়া যে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য কষ্ট

পাইতেছি, তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—'আপনি কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। কাজে কাজেই ও সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানা আছে, আপনাকে বলিব।' সেদিনকার মত তাঁর অনূদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণখানি আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই বইখানি পড়িয়াই আমার বড় অনুতাপ হইয়াছিল —এত বড় এক জন পণ্ডিতের সম্বন্ধে এমন ভুল ধারণা করিয়াছিলাম! বাস্তবিকই রামেন্দ্রসুন্দর অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের দুরূহ স্থানসমূহও আমাকে এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে আমি খুব একটা উঁচু স্থান না দিয়া থাকিতে পারি নাই। কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধ, তাহাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, এগুলি তিনি আমাকে সেই হইতে সুচারুরূপে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেন। সেই দিন হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, রামেন্দ্রসুন্দর এক জন বাস্তবিক পণ্ডিত—তাঁর কথা বইয়ের কথা নয়।

ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, গুণের চেয়ে দোষের ভাগটা আমাদের বেশী। সে সব দোষের ভিতর একটা দোষ মাথা উঁচু করিয়া পরের কাছে আমাদের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সে দোষটা হইতেছে এই যে, বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি বা নাই পারি, নিজে আয়ত্ত করিতে পারি বা নাই পারি, দুটো পাতা পড়ি বা নাই পড়ি, লোকের কাছে কিন্তু ঘোষণা করিয়া দিতে চাই—আমি ও বিষয়টা খুব শিখিয়াছি। এই যে মস্ত একটা দোষ—এটা আজকাল বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। এটা কিন্তু আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরের ছায়াও মাড়াইতে পারে নাই। যেটুকুতে তাঁর একটুকুও সন্দেহ থাকিত, সে সম্বন্ধে তিনি ভুলিয়াও বলিতেন না, 'আমি উহা জানি'। এটা কিন্তু কেহ মনে করিবেন না, নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসহীনতার পরিচায়ক। ইহাই মনুষ্যত্বের একটা মস্ত লক্ষণ—প্রকৃত পণ্ডিতের প্রধান গুণ। যতক্ষণ একটা জিনিসকে নিজের করিতে না পারি, ততক্ষণ কাহারও কাছে বলিব না যে, আমি উহা শিখিয়াছি। জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ইহাই

মূলমন্ত্র করিতে হইবে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দরও তাহাই করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে তিনি একটু জ্ঞান আছে স্বীকার করিতেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যজ্ঞ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি এমন করিয়া উহা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল—সে বিষয় তাঁর সম্পূর্ণ জানা আছে। আমাকে বুঝাইবার কিছু দিন পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি এমন সুন্দর হইয়াছিল, এমন গবেষণাপূর্ণ হইয়াছিল যে, আজকাল ওরূপ খুব কম পণ্ডিতেই বলিতে পারেন, বা লিখিতে পারেন। সংক্ষেপে আমার শিক্ষাদাতা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিলাম, এখন একবার আমার শান্তিদাতা রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিতে চাই।

আপনাদের আগেই বলিয়াছি, প্রথম বারেই যখন রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখনই উঁহার প্রীতিময়ী প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সেই হইতেই যখন আমার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, তখনই উঁহার নিকটে গিয়া বসিতাম। হয় ত দেশের কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া মন অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে—তখনই উঁহার নিকটে গিয়া বসিতাম। মনে বড় বিশ্বাস ছিল যে, মহাত্মা রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত দুটো গল্প করিলে, তাঁর মুখের দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিলে শান্তিলাভ করিতে পারিব। বাস্তবিকই কাজেও তাই হইত। যখনই যাইতাম, হাসিমুখে বড় আদর করিয়া কাছে বসাইতেন—যেন চিরপরিচিত। শান্তভাবে কত গল্প করিতেন—যেন কত দিনের আত্মীয়তা।

সেবার আমার বড় অসুখ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিলাম বলিয়া নিজের কোনও কাজ করিতে পারিতাম না। কাজ করিতে না পারায় এমনই কষ্টবোধ হইত যে, একা থাকিতে খুব অশান্তি ভোগ করিতাম। সেই জন্য সেবার কিছুদিন প্রায় প্রত্যহ উঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। একদিন তিনি

বলিলেন,—'কি কিমুরা সাহেব, আসুন, কোনও কাজ আছে?' বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিকই ত কোনও কাজ নাই—কেন প্রত্যহ উঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি। কি আর উত্তর দিব, বলিলাম—'কোনও কাজ ত নাই—আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।'—'বেশ—আসুন। কাজ না থাক্‌লে এখানে কি করিতেন?' 'অসুখের জন্য কাজ কর্‌তে না পারায় বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি, আপনার কাছে একটু শান্তি লাভ করিতে এসেছি।' রামেন্দ্রসুন্দর বড় আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এখানে আসিলে কি আপনার শান্তি হয়?' 'হাঁ, আপনার শান্ত হাসিমুখ দেখিলে হৃদয়ে বড় শান্তি পাই।' আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর চ'খে সে দিন জল আসিয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে—আর তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না. বলিয়াছিলেন—'কিমুরা মহাশয়—আমাদের দেশ দরিদ্র হইলেও সেই শান্তিভাবটা এখনও রহিয়াছে।' বাস্তবিক কথা বলিতে গেলেও তাই। প্রাচীন ভারতের স্মৃতিচিহ্ন ঐ রকম দুই একটা ভাবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এইখানে দুটো নিজের কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাধারণতঃ জার্ম্মাণী, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডে বিদ্যা-শিক্ষা করিতে যান। তাঁরা যে কিছু না কিছু করিয়া আসেন, এমন নহে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এক রকমের পণ্ডিত হইয়া আসেন। যখন আমি সংস্কৃত ও দর্শন পড়িবার জন্য ভারতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, বন্ধুবর বলিলেন—'তুমি ভারতবর্ষের মত গরম দেশে কেন যাইতেছ? ওই কুসংস্কারপূর্ণ দেশে গিয়া তোমার কি শিক্ষা হইবে?' মাতা, পিতা ও জ্ঞাতিগণ সকলেই ভারতে আসায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁদের মতে মত দিতে পারি নাই—হয় ত ইউরোপে বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিয়া, ক্রমবিকাশের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখিয়া ঐ বিষয়গুলি শিখা যাইতে পারে—ভারতবর্ষে হয় ত সেটা হইবে না। কিন্তু যে দেশের জিনিস—সেটা ধর্ম্মই হউক, বা সাহিত্যই হউক, বা দর্শনশাস্ত্রই

হউক, কিংবা অপর যে কোনও বিষয়ই হউক না কেন,—যে দেশের জিনিস সে দেশের সহিত সে সকলের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সে দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা না করিলে, সে দেশের জিনিসগুলিকে ঠিকমত কখনও আয়ত্ত করা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্য প্রভৃতি অন্য দেশে গিয়া শিক্ষা করিলে ভারতীয় বিষয়সমূহের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। এই জন্যই আমি ভারতে আসিয়াছিলাম। বন্ধুগণের কথা, এমন কি, পিতা-মাতার কথার চেয়েও আমার এই বিশ্বাসটাকেই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। দেশের দেশীয়ত্ব বাদ দিয়া, সে দেশের জিনিসকে নিজের করিবার ইচ্ছাটা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করা কতদূর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তাহা বলিতে পারি না।

শেষ কথা—রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় নিরহঙ্কার ও বিচক্ষণ পণ্ডিতের সহিত মেশায় আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে যে গুণসমূহে গুণান্বিত মনে করিয়াছিলাম, তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতা প্রথম। আমি তাঁহাকে কোনও দিন কোনও কথারই হঠাৎ উত্তর দিতে দেখি নাই। সব সময়েই বেশ চিন্তা করিয়া উত্তর দিতেন। তাঁহার একটা বড় গুণ দেখিয়া-ছিলাম, তিনি কখনও কাহারও উপর রাগ করিতেন না—আমি তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। এই শান্তিপ্রিয়তাই তাহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই স্থিরচিত্ত ছিলেন। চাঞ্চল্য ভাব কখনই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত না। এমন নিরহঙ্কার ছিলেন যে, সেরূপ বড় মিলে না। এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন—'কিমুরা সাহেব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাকে কিছু শিখাইয়া দেন না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিব।' গত বৎসর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অধ্যাপনা করিবার ভার পাই, তখন তিনি বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন,

বলিয়াছিলেন—'বেশ হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে পুস্তক লিখিবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়টা বাঙ্গালাতেও প্রকাশ করিয়া আমাদের দিবেন।'"

এরূপ চিন্তাশীল, শান্তিপ্রিয়, নিরহঙ্কার আদর্শ পণ্ডিত আপনাদের দেশে হয় ত অনেক আছেন, কিন্তু আমার দেশে বড় ক্বচিৎ পাওয়া যায়। তিনি যে কত সৌন্দর্য্যের আধার ছিলেন, তাহা আমি অজ্ঞ—সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে পারিব না। মোট কথা, তাঁকে দেখিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে, 'স্বভাবে সুন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, বিদ্যায় সুন্দর, এবং হাসিতে সুন্দর ছিলেন, সে কথাটার সার্থকতা বেশ বুঝিয়াছিলাম।—নামে যে সুন্দর ছিলেন, সেটা ত আপনাদের অনেক দিনের জানা কথা। সেই ত সেই দিন তাঁকে দেখিয়াছিলাম —তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে চাহি না।—আপনারাও বোধ হয় আমার কথায় সায় দিতে আপত্তি করিবেন না। যখনই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে, তখনই তাঁর প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার মনের ভিতর জাগিয়া উঠে। তাঁকে যেন তখনই দেখিতে পাই। কেমন করে বলিব, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর যশঃসৌরভ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

আপনাদের দেশ, তাঁর জন্মভূমি;—এখানে আপনারা তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার অনেক আয়োজন করিবেন, সন্দেহ নাই;—আর তাঁর কার্য্যই তাঁর স্মৃতিকে সকলের মনে চিরদিন জাগাইয়া রাখিবে। তবে আমি তাঁর এই বিদেশী ভক্ত—তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তাঁর বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি আমার মাতৃভাষায় অনূদিত করিয়াই আমার দেশে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিব।

---

(৬)

লেখক

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যু-কথা মনে হইলে, সংযত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সহজ নহে। তাঁহার সহিত যে প্রকার আন্তরিক বান্ধবতা-সূত্রে আমি আবদ্ধ ছিলাম এবং তাঁহার অলোকসামান্য গুণাবলীর জন্য আমি যে প্রকার মুগ্ধ ছিলাম, তাহাতে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করা আমার পক্ষে এক দিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, তদ্রূপ অন্য হিসাবে উহা নিতান্ত কঠিন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যিনি যাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত, তিনি কেবল তাঁহার গুণই দেখিতে পান, দোষ দেখেন না; আমি বলি, এই কথা কোন কোন স্থলে সত্য হইলেও এমনও অনেক স্থানে দেখা যায় যে, যিনি যাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত, তিনি তাঁহার গুণাবলী সম্যক্ দেখিতে বা অবধারণ করিতে পারেন না। এই কথার উদাহরণ আমাদের স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু। আমরা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম বলিয়া বাস্তবিকই তাঁহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও প্রকৃত মহত্ত্ব অনেক সময়ে অনু-ধাবন করিতে পারিতাম না। মনে ভাবিতাম যে, তিনি বোধ হয়, আমাদের মতই একজন লোক, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার মেধা, এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এতই অধিক যে, তাহার ইয়ত্তা করিবার সাধ্য আমাদের অতি অল্পই ছিল। তিনি কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-সংক্রান্ত গবেষণা সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনি যে প্রকার কৃতিত্ব সহকারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যে প্রকার

ব্যাখ্যা করিয়া সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বেদান্তাদি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; এ কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট জ্ঞাত না থাকিলেও, ইহা সত্য। তাঁহার বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা বঙ্গদেশে জানেন না, এমন লোক নাই। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার সুন্দর প্রণালী আদর্শস্থানীয় ছিল, এ কথা তাঁহার ছাত্রেরা চিরদিনই কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল; যে যে শাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত ছিল, সেই সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য বিজ্ঞানাদি ও দর্শনাদি শাস্ত্রের এক এক বিভাগে কৃতী বাঙ্গালীর অভাব নাই, কিন্তু এক ব্যক্তিরই বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন হওয়া একান্তই দুর্লভ। কেবল স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে নিঃসংশয়িতরূপে বলা যায় যে, তিনিই একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। শব্দশাস্ত্রে ও ভাষাতত্ত্বে তাঁহার প্রগাঢ় গবেষণা তাঁহার রচিত নানা পুস্তকে ও প্রবন্ধাদিতে সুপরিস্ফুট। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইদানীং কয়েক বৎসর ঐ সকল সাহিত্যের আলোচনায় তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন সুযোগ্য সহযোগী ছিলেন।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, এত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও, তাঁহার গ্রন্থাদি প্রায়শঃ বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যে প্রকার ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা অপেক্ষা কম ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিকেও দেখিয়াছি যে, কোন পুস্তক রচনাকালে তিনি ইংরাজী ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করেন না। স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু মনে করিলে তাঁহার রচিত গবেষণা-

মুলক গ্রন্থাদি অনায়াসে ইংরাজী ভাষাতেই সুন্দররূপে লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভাষার প্রতি এত প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, তিনি তাঁহার গবেষণা ও চিন্তা-প্রসূত বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রথিত করিয়া স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইয়াছে এবং আমাদের মাতৃভাষা যে কত প্রকারে পুষ্ট হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার যদি কেবল যশঃ ও খ্যাতির কামনা থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইংরাজী ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদি রচনা করিলে, হয় ত তাঁহার নাম সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সুপ্রচারিত হইত এবং দেশবিদেশ হইতে তিনি শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট যথাযোগ্য পূজা পাইতেন। কিন্তু তাঁহার মনের গঠন অন্য প্রকারের ছিল। তিনি ভাবিতেন, তিনি যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশবাসীর উপকারার্থই দেশের ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্যই ব্যয় করিবেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বাঙ্গালী মাত্রেরই অনায়াসগম্য করিয়া দিয়াছেন এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যে সহজ এবং সুন্দররূপে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহার এক প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া অধুনা কৃতী বঙ্গবাসী মাত্রেই বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া যুগপৎ মাতৃ-ভাষাকে পুষ্ট এবং স্বদেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারের সহায়তা করিবেন। এই কাজ করিতে পারিলে, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিকে প্রকৃত পক্ষে সম্মান করা হইবে।

স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর জীবনচর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার একটি প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য এই,—তিনি কল্পনা

করিতেন, আমাদের মাতৃভাষা বর্ত্তমানে নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণ; মাতৃভাষাকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করিতে হইবে, জ্ঞানরাজ্যের যাবতীয় বিভাগ-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা এবং গবেষণা করিয়া তাহার ফল যাহা পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় বিন্যস্ত করিয়া বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীর গোচরে আনিতে হইবে। বিদেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া আমরা যে কিছু জ্ঞান-লাভ করিয়াছি, কিংবা ভবিষ্যতে করিব, তাহা একত্র সঞ্চয় করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার না করিলে আমাদের ঐ সকল জ্ঞান কোন ফলপ্রসূই হইতে পারে না—এক প্রকার বন্ধই থাকিয়া যায়। সুতরাং শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যে যাহা কিছু আলোচনা করেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা। স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু এই মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়াই সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন-কল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যে স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করেন, তাহার প্রধান কারণ এইখানে। একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে, তাঁহার পার্শ্বচররূপে আমি এবং আমার অনেক বন্ধু তাঁহার কার্য্যে আমাদের যথাসাধ্য শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছি। প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার সহায়তা কাঠ-বিড়ালের ন্যায় হইলেও আমি এ কথা এখানে নিজে খ্যাপন করিলাম কেন, তাহার কারণ অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সাহিত্য-পরিষদের সহায়তাকল্পে আমার নিজের ব্যক্তিগত কথা বলার কারণ এই যে, স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর জীবনের যে অংশ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, আমি স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনের সেই ভাগের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত এবং তাঁহার জীবনের সেই ভাগের কাহিনীর সহিত আমাদের মধ্যে পরস্পরের আন্তরিক প্রীতির কথা বিজড়িত রহিয়াছে। বহু দিন তাঁহার সহিত আমি একত্রে পরিষদের অনেক কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছি। তাহাতে তাঁহার মনের

প্রকৃত মহত্ত্বের কথা, তাঁহার দেশাত্মবোধের কথা, তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনন্যসাধারণ অনুরাগের কথা বুঝিতে পারিয়াছি এবং এই ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া, আমি চিরকাল তাঁহার গুণমুগ্ধ আছি ও থাকিব। সাহিত্য-পরিষদের মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া উহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলির সহিত স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি এমন ভাবে বিজড়িত যে, যত দিন ঐ পরিষৎ থাকিবে, এমন কি, যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর নাম বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মী আর দ্বিতীয় ছিল না; তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই মন ও প্রাণ পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাঁহারই আকর্ষণে, তাঁহারই আদর্শে এবং তাঁহারই চরিত্রদর্শনে কত ব্যক্তি যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সাহিত্য-পরিষদে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন; সেই কথা বলিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হয়, দুই এক কথায় তাহা বলা চলে না। আমি এখানে ঐ সম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলিব।

আপনারা সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমানে কিছু দিন ধরিয়া আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা কোন্ ভাষার সাহায্যে হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এমন দিন গিয়াছে, যখন উচ্চশিক্ষা প্রচলন বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হওয়া উচিত, এই কথা বলিলেই, শিক্ষিত ও মনীষাসম্পন্ন অনেক বাঙ্গালীও বলিতেন যে, যাঁহারা ঐ প্রকার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা উচ্চশিক্ষার মূলোচ্ছেদ করেন। বেশী দিনের কথা নহে, ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজে এ কথা শুনিয়াছি। সকলেরই মনে ধারণা ছিল যে, উচ্চশিক্ষা এমনই পদার্থ যে, বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইতেই পারে না। দেশে অজ্ঞানের মোহ এতই ছিল যে, মাতৃভাষা ব্যতীত যে

কাহারও কোন প্রকার শিক্ষা প্রকৃত ভাবে হইতে পারে না, এই সহজ সত্যটি অনেকেই অবধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন ঐ মোহজাল ছিন্ন হইয়াছে। যদি আমরা এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণ বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক চেষ্টার ফলেই উহা ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কথা বলিলে, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে যে, এতৎসম্পর্কে পরিষৎ যাহা করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে সেই অদ্বিতীয় পুরুষ আমাদের বন্ধুবর স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু ছিলেন বলিয়াই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই প্রকার কঠিন কার্য্যে সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করা গিয়াছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনপ্রণালী সংস্কারকল্পে যে কমিশন সে দিন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারা এই বিষয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত করিবেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা এই বিষয়ে দুই দিক্ রাখিয়া যে একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহার কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই; প্রশ্নটি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, দেশের লোকের মনোযোগ ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে প্রচলন হইবার ব্যবস্থা সংঘটিত হইতে আর বিলম্ব নাই এবং কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। এই যে দেশের লোকের মত-পরিবর্ত্তনের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম এবং অচিরে বাঙ্গালা ভাষা যে তাহার প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া আমাদের দেশবাসীকে ধন্য করিবে, এই আশার মূলে যে সকল ব্যক্তির চেষ্টা ও যে সকল ব্যক্তির যত্ন আছে, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর আসন অতি উচ্চে। তিনি কেবল এই কাজের জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বাঙ্গালী কখনই তাঁহার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

তাঁহার দেবোপম চরিত্র, ঋষিতুল্য সরলতা, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ইত্যাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে,

তিনি কি প্রকার স্বর্গীয় প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় তাঁহার যে ধীর প্রকৃতি ও সহাস্য মূর্ত্তি এবং অনাবিল ও অকৃত্রিম সখ্যতার ভাব প্রকাশ হইত, তাহা আমাদের হৃদয়ে চির-মুদ্রিত আছে ও থাকিবে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালীর যাহা গিয়াছে, আমাদের যাহা গিয়াছে, তাহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই; সকলেই তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় আমার ভাষার অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন উহা বুঝিবার পক্ষে, আশা করি, কাহারও অভাব ঘটিবে না।

---

(৭)

লেখক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কুমিল্লা রাণীর দীঘির পাড়ে একটা খড়ো ঘরে আমি রোগের শয্যায় প'ড়ে বড় কষ্টে সময় যাপন করিতেছিলাম। ডাক্তারগণ বলিয়াছিলেন, আমি আর ভাল হব না, আমি আর বই লিখিতে পারিব না, এই নিদারুণ চিত্র ভবিষ্যতের সম্মুখে দেখিয়া আমি ভীত ও কাতর ভাবে মৃত্যুর কামনা করিতেছিলাম; তখন আমার বয়স ২৯, এবং সেটা ১৮৯৬ সনের ডিসেম্বর মাস। শীতের প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সারারাত্রি অনিদ্রা ও নৈরাশ্যের পরে এক দিন আমি মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র আমার হাতে দিয়া গেল, পত্রখানি রামেন্দ্র বাবুর। আমি তখনও তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু এই অ-দৃষ্ট ব্যক্তির আশ্বাস-বাণী আমার নিকট যেন অ-দৃষ্টের আকাশ হইতে ঘনঘটা দূর করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গের জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিল। তার পর কলিকাতায় আসিলাম, তখন কত দিন শয্যাপার্শ্বে আমার চিরপ্রফুল্ল বন্ধুর মুখখানি দেখিয়াছি। তাঁহার উৎসাহ-আশ্বাস শুধু মুখের কথায় ব্যয় হয় নাই, তিনি যে পর্য্যন্ত পরের কষ্ট দূর করিতে না পারিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত ব্যথিত থাকিয়াছেন। তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্য ভিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কি করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই। তাঁহার এই সুগভীর আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ফলে আমি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়কে পাইলাম, লালগোলার রাজা বাহাদুরকে পাইলাম। আমি যে কয়েক বৎসর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও জড়বৎ

পড়িয়া ছিলাম, সে কয়েক বৎসর আমি তাঁহাকে ঘন ঘন আমার বাড়ীতে দেখিতে পাইয়াছি। আজ অমুকে এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, রামেন্দ্র বাবু প্রফুল্ল মুখে আমাকে আসিয়া প্রায়ই এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে হইত, রামেন্দ্র বাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ আমাকে সহায়তা করিতেছেন। সে সকল দিনের কথা মনে হইলে, আজও আমার চক্ষু সজল হয়। হে বন্ধুবর, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু ছিলে। যখন হইতে আমার রোগ ভাল হইল, তখন হইতে তোমার শুভাগমন বিরল হইতে লাগিল। সুখের সময় আমি তোমাকে তেমন করিয়া পাই নাই, কিন্তু দুঃখের সময় তোমার সহৃদয়তা, তোমার গভীর স্নেহ আমি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু যেখানে কাহারও কিছু গুণ আবিষ্কার করিতেন, তখনই তার পক্ষপাতী হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে সেই গুণের উৎসাহ দিতে যাইতেন। যাদুকরের মন্ত্রপূত দণ্ড যেরূপ স্পর্শদ্বারা বিরাট সৌধমালার সৃষ্টি করে,—রামেন্দ্রের হৃদয়ের গভীর অনুরাগে সামান্য আয়োজন হইতে এই বিরাট সাহিত্য-পরিষদের তেমনই সৃষ্টি করিয়াছে। এ বিষয়ে আমার অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গসাহিত্যের তিনি মহারথ ছিলেন, তাঁহার শিক্ষা, অধ্যপনা-শক্তি ও কর্ম্মঠতা সকলই অসাধারণ ছিল। তিনিই নিঃস্বার্থভাবে আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা উজ্জ্বল আছে ও থাকিবে।

তাঁহার দোষের মধ্যে দুই একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমটি হইতেছে, তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা। তিনি রুগ্নদেহে যদি সাহিত্য-পরিষদের জন্য এতটা না খাটিতেন, তবে বোধ হয়, অকালে তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটিত না।

তাঁহার হাতের লেখা অতি বিশ্রী ছিল। শুনিয়াছি, উত্তর-পশ্চিমের কোন লোক 'আজমির গেয়া' কথাটি 'আজ মর গিয়া' পাঠ করিয়া পুত্র-শোকাতুর হইয়াছিল; রামেন্দ্র বাবুর হাতের লেখায় এরূপ রহস্যকর ভ্রম অনায়াসে ঘটিতে পারিত।

তাঁহার লেখা পড়িতে না পারিয়া সময়ে সময়ে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইতাম। এক দিনের কথা বলিতেছি—প্রতিশোধ লইবার সংকল্পে আমি তাঁহাকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, তাহাতে হিজিবিজি কিছু লিখিয়া অর্থাৎ কতকগুলি বক্র, সরল ও গোল রেখা ও বিন্দু আঁকিয়া কার্ডখানি ভর্ত্তি করিয়া ফেলি এবং তার মধ্যে মধ্যে দু'একটি বাঙ্গালা শব্দ লিখিয়া চিঠিখানি যে বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছে, তাহার একটা বাহ্য ঠাট বজায় রাখিয়া নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক তাহা ডাকে ফেলিয়া দিই। পর দিন প্রাতে দেখিলাম, আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীতে রামেন্দ্র বাবু গাড়ী করিয়া আসিয়া হাজির। অতি বিরক্তভাবে ও উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি আমায় বলিলেন, 'কি যে মুণ্ডু লিখিয়াছেন, বুঝিতে না পারিয়া কাজ ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'আপনি জীবন ভ'রে যে সকল অপকর্ম্ম করে এসেছেন, এ কার্ডখানি হচ্ছে তার প্রত্যুত্তর, এতে কিছু লেখা হয় নাই।' খানিক কাল তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর মেঘ কাটিয়া গেলে যেরূপ রৌদ্রের রেখা দেখা যায়, সেইরূপ তাঁর মুখে হাসি ফুটিল, সে হাসি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ভুলবেন না, সে হাসি রামেন্দ্র বাবুরই মত, তার অন্য কোন উপমা নাই।

---

(৮)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ

রামেন্দ্রবাবু যে সত্য সত্যই আমাদের ছাড়িয়া অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা এখনও বিশ্বাস হয় না। এই সে দিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি কত রকম বিষয়ের আলোচনা করিলেন। এখনও সর্ব্বদা মনে হয়, যেন সেই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সরল ব্যাখ্যা শুনিতেছি। বাস্তবিক, কতকগুলি লোকের এমন একটা অমরতা, এমন একটা অবিনশ্বরতা থাকে যে, মৃত্যু যে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপ লোক ছিলেন। অথচ তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। আমি ত তাঁহাকে গত এগার বৎসরের মধ্যে কখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে দেখি নাই। তাঁহার চোখের দীপ্তিতে ও হাসিতে এমন একটা অজর অমর ভাব ছিল, যাহা দেহের সহস্র দুর্ব্বলতা ভেদ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিত। রামেন্দ্র বাবুর সমস্তটাই দেহী ছিল, দেহের অংশটা দেহীর মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার দেহ শীঘ্রই কাজে ইস্তাফা দিল।

তাঁহার হাসির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ হাসি আমার জীবনে আর কাহারও কখনও দেখি নাই। সকল প্রকার বৈষম্য, সকল প্রকার সন্দেহ, তাঁহার হাসির সাম্‌নে পলাইয়া যাইত। একবার মনে পড়ে, কতক জন নবীন সাহিত্যিক 'হিতবাদী' পত্রে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ত্রিবেদী মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি ত্রিবেদী মহাশয়কে এ সমালোচনা দেখাইলে, তিনি কেবলই হাসিতে লাগিলেন। সে হাসিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা

অসম্ভব। সে হাসি সমালোচকের তীব্র প্রতিবাদকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিল। সে হাসি স্পষ্টই সকলকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিল যে, তুচ্ছ জগতের প্রশংসা বা নিন্দার কত ঊর্দ্ধে তাঁহার চিত্ত ভ্রমণ করিত। সে রাজ্যে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই, সে রাজ্যে বিশুদ্ধ মৈত্রীভাব, সার্ব্বজনীন প্রীতি ভিন্ন আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল হাসিতে নহে, ত্রিবেদী মহাশয়ের সকল ক্রিয়াকলাপে এইরূপ একটি অশরীরী লোকের আভাস পাওয়া যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আজ দুই বৎসর হইবে, সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে ভীষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইবার পর এক দল লোক সক্রোধে পরিষৎ মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ত্রিবেদী মহাশয় কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি যে নিত্যবুদ্ধ শুদ্ধমুক্ত চৈতন্যের উপাসক ছিলেন, সেই চৈতন্যের ন্যায় তিনিও নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্পভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে কিছু যে সে দিন ঘটিয়াছে, তাহা একেবারেই বোধ হইতেছিল না।

তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও, মনের জোর খুব বেশী ছিল। তাঁহার মত তিনি হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না; কিন্তু যখন করিতেন, তখন খুব দৃঢ়তার সহিত করিতেন এবং খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতকে পোষণ করিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একগুঁয়েভাবে তিনি কোনও মতকে ধরিয়া থাকিতেন। বয়সের ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। দেহ যত দিন সজীব থাকে, তত দিন যেমন বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সেইরূপ মানুষের বুদ্ধিও যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহাও বহির্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ত্রিবেদী মহাশয়ের মন নূতন সত্য গ্রহণ ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অসাধারণ পটু

ছিল। আমার নিকট তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ কয় বৎসর অসাধারণ যত্নের সহিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নের ফল আমরা তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, কর্ম্মকথা, বিচিত্র-প্রসঙ্গ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধাবলীতে দেখিতে পাই।

রামেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিতেন। কখনও তাঁহার মুখে তাঁহার নিজের কীর্ত্তির সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাই নাই। পরের যদি কোনও গুণ দেখিতেন, অথবা কোনও সৎকার্য্যের খবর পাইতেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহা সাধারণের গোচর করিতেন। নিজের বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত করিতেন। তিনি যে কখনও কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনেই হইত না, অন্যের নিকট তাহা বলা ত দূরের কথা। আমার এই সংস্রবে একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আজ নয় বৎসর হইল, আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ জর্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদ করিয়া জর্ম্মাণীর কোনও দার্শনিক পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করি। প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে ত্রিবেদী মহাশয়কে অনুবাদটি একবার দেখাই, এবং তাঁহার মত লই। তিনি তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

'আমার প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই......স্বদেশের ও বিদেশের আচার্য্যগণের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার আর কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও ছিল না। রচনাগুলির মধ্যে আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে বলিয়া কখনও কোনও স্পর্দ্ধা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই ; কোনও নূতন কথা কখনও বলিয়াছি বলিয়াও ধারণা জন্মে নাই।'

ইহা অপেক্ষা অহঙ্কারশূন্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর কি হইতে পারে? অহঙ্কারকে তিনি যেমন দমন করিয়াছিলেন, অন্যান্য রিপুগুলিকেও তিনি সেইরূপ নাশ করিয়াছিলেন। ক্রোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতই বিরক্তিকর ব্যাপার তাঁহার ঘাড়ে পড়ুক না কেন, তিনি কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল—তাঁহার হাসি। তাঁহার সহাস্য বদনের সম্মুখে বিরক্তি যেন আসিতেই সাহস পাইত না।

এই সকল কারণে মনে হয় যে, তিনি গীতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।'

কিন্তু গীতার এই আদর্শ মনে করিলে আমাদের যেরূপ কর্কশ কঠোর লোকের চিত্র মানস চক্ষুতে উদিত হয়, ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরে সেরূপ কর্কশতা, সেরূপ নির্ম্মমতা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। রামেন্দ্রবাবুর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। পরের দুঃখ তিনি একেবারেই সহিতে পারিতেন না। বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে শোকে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতরে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না।

বাস্তবিক ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাব একেবারে মধু-ঢালা ছিল। এই জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—'তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার সকলই সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে অভিবাদন করি।' সে কালের আর্য্য-ঋষিগণ সমস্ত পৃথিবীকে মধুময় দেখিতেন। 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।' ত্রিবেদী মহাশয় আর্য্যদিগের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তিনি নিজে মধু ছিলেন, এবং সমস্ত জগৎটাকে মধুময় দেখিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া থাকিত।

এইবার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী চরিত্রগুণে ও পাণ্ডিত্যে সে অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ২৫৲টাকা বৃত্তি পান। পরে তাঁহার খুল্লতাতের সহিত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি বি এ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক পেডলার সাহেব এই পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রবাবুর কাগজ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি এ পর্য্যন্ত রসায়নের যত কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই out and out the best'. ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় এম্ এ পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার পর রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

রামেন্দ্র বাবুর কর্ম্মজীবনের কথা বলিলেই, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের নাম মনে পড়ে। সাহিত্য-পরিষদ্‌টি ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে-গড়া জিনিষ। ইহার জন্য তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহার ফল আমরা সাহিত্য-পরিষদের সুন্দর ভবনে ও বহুবিস্তৃত কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অবশ্য আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একমাত্র ত্রিবেদী মহাশয়ই সাহিত্য-

পরিষদের স্থষ্টিকর্ত্তা। এ কথা বলিলে যে সকল মহাত্মা তাঁহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সাহিত্য-পরিষদ্‌কে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তবে ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তিনি সাত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে তিনি উহার সভাপতি মনোনীত হ'ন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম দুর্ভাগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ উন্নতি হইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রিপণ কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়ের কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইবার অল্প দিন পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়াছিল। প্রথমে তিনি অধ্যাপক ভাবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে রিপণ কলেজের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। এরূপ এক কলেজে জীবনের সমস্তটা যাপনের উদাহরণ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজে ঢুকিবার পূর্ব্বে তাঁহার গবর্মেণ্টের চাকরী পাইবার একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি এক দিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্মেণ্টের এডুকেশন্ ডিপার্টমেণ্টে চাকরীর জন্য ডিরেক্টারের নিকট আবেদন করেন। তাহার ফলে ডিরেক্টার তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টারের আফিসে উপস্থিত হ'ন, এবং চাপরাশীর দ্বারা কার্ড পাঠাইয়া দেন। কার্ডটী ডিরেক্টারের নিকট লইয়া

যাইবার সময় চাপরাশীটি তাঁহার নিকট বখশিস্ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী মহাশয় এত বিরক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, 'দূর ছাই, গবর্মেণ্টের চাকরী, যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পরে না জানি কত রকম গোলমাল।' এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টারের সহিত দেখা করিলেন না। এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও প্রকার বক্র মার্গ দ্বারা কোনও রকম সুবিধা পাইবার চেষ্টা করা, তিনি যে মতে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সে মতের বিরুদ্ধ ছিল। সরল সহজ পথে চলিয়া যতটা সাংসারিক উন্নতি সম্ভবে, তাহার বাহিরে অন্য কোনও প্রকার সুবিধার চেষ্টা করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি নিজে যেমন কোনও প্রকার কুটিল মার্গ পছন্দ করিতেন না, অন্যকেও তিনি তেমনই কোনও প্রকার কুটিলতা অবলম্বন করিতেও প্রশ্রয় দিতেন না। কোনও প্রকার তোষামোদ বা অনুরোধ-উপরোধ তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার অধ্যক্ষতায় রিপণ কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপ্যালকে খোসামোদ করিবার বা তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।

কেহ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া কোনও অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, 'এ কথা ত আমাকে কলেজেই বলিতে পারিতেন, এত কষ্ট করিয়া বাড়ীতে আসার কি দরকার ছিল?' তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের মধ্যে এরূপ মধুর সম্বন্ধ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোকগত

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রামেন্দ্রবাবু 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্ত' ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু এক দিন আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্র বাবুর উৎসাহ ব্যতীত তিনি কখনও কিছু লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ত্রিবেদী মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে, তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মের কথা না বলিয়া পারা যায় না। কেন না, সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ-সাহিত্যে রামেন্দ্র বাবুর স্থান অতি উচ্চ—এ কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস-বিভাগে রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় যে কিরূপ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্র বাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গালাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বে অনেক রচিত হইয়াছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মত নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটেন। Aristotle এই জন্য দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics, অর্থাৎ—যাহা

Physics-এর জ্ঞানলাভের পর, Physics-এর মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্ম্মাণ ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে Nachdenken বলে, (অর্থাৎ Denken বা বস্তু-চিন্তার পর যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই Nachdenken, অর্থাৎ—এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোণ্টস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থাকেন, 'কিরূপ পথ দিয়া এত দূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য ?' 'প্রকৃতি'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পূরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই জায়গায় যেন ভাঁটার টানের আভাস পাওয়া যায়। 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্ত্তি'-নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খট্কা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম; বুঝি বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাশ্যের বিরাট শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। এই খট্কা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপত্তি। যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত্যকে খুঁজিতে হইবে ? জিজ্ঞাসার প্রথম প্রবন্ধ 'সত্য'তে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটী

বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক সত্য, জীবন-যাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা'-শীর্ষক প্রবন্ধ, এবং রিপণ কলেজে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোন সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

'আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমাদের অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।'

ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য, জীবনধারণের সুবিধার জন্য মানিয়া লওয়া সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য, Absolute Truth.

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি' ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কি? আমি কখনও পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত স্তব্ধভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি, সর্ব্বদাই বিচলিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্ব্বিকার শান্ত শুদ্ধস্বভাব।

প্রথম 'আমি'কে জীবাত্মা বা Phenomenal self এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে পরমাত্মা বা Transcendental Self বলা যায়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলতঃ একই। যে আমি পরমাত্মা, সেই আমি আবার জীবাত্মা; ইহা Kant-ও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক Technicalities লইয়া বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'আমি' থাকিলেই ত হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর ঋগ্বেদে আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ—ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই আমার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ।

এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে।

'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ'; 'যজ্ঞেন যজ্ঞমজয়ন্ত দেবাঃ'—সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সম্বন্ধ।

এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—

• 'এই বিশ্ব ব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ।

কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।'

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য বস্তুই যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই সকল ভোগ্য-বস্তুরই—যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভোগের কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্ম্মকথার 'যজ্ঞ'-শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।'

পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ—ত্যাগাত্মক—ইহা দেখান ও বোঝানই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্মকথা'-গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ, অর্থাৎ—তাহা Ethical, আবার কর্ম্মমাত্রই ঋত, অর্থাৎ—Cosmic process. কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই নৈতিক (Ethical), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলতঃ এক। 'ধর্ম্মের জয়'-শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটি ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

'যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝা-বায়ু

বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্ম্মে ও অসৎ কর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে 'এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।'

এইখানে একটু খট্‌কা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু Morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে, এই সাংসারিক বা ব্যাবহারিক জীবনের Morals-এর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্ম্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম্ম এই প্রাতিভাসিক বা Intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতিদিনের মেশামিশি, প্রতিদিনের মাখামাখির সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয় প্রাতি-ভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক মত লইয়া এত কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল দর্শন লইয়াই থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার

কত দূর প্রবেশ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'-নামক পুস্তক তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার-ব্যবহার কালের সহিত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্ শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক্ শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা আছে, তাহার সহিত গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় Doctrine of Logos-এর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটি রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং তাহা হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদিগকে দেয়। এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা খ্রীষ্টানেরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল, তাহা, এবং খ্রীষ্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। কৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। আবার এ দিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে গাভী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে গো-শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা—ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্,

ভারতী প্রভৃতি এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতির্বাঙ্-নামানি।' এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক্= =গো=ব্রহ্ম, এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। সময়াভাবে সেগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। যে দুইটির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর ঐতি-হাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না, সন্দেহ। কোনও কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlain-এর 'Foundations of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlain-এর পুস্তকে ইউরোপের Culture-history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী Dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু Dogmatic ভাবের লেশমাত্র নাই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বনি-বিচার' নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার, কেহ কখনও এ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার মূলেও ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানতঃ রামেন্দ্রবাবুরই চেষ্টা।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ত্রিবেদী মহাশয় অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনও ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি অসাধারণ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কখনও চিঠিপত্র লিখিতেন না; ধুতি-চাদরও কখনও ছাড়িতেন না। শুনিয়াছি, প্রথম জীবনে কলেজে চোগা চাপ্‌কান পরিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে ধুতি-চাদর ভিন্ন অন্য কোনও বেশ তাঁহার দেখা যাইত না। বাহিরেও যেরূপ, ভিতরেও সেইরূপ, তিনি খাঁটী স্বদেশী ছিলেন। তিনি বিদেশীর যাহা ভাল, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনও চোখ বুজিয়া বিদেশীর অনুকরণ করিতেন না। সে দিন অপর একটি স্মৃতিসভায় একজন বক্তা বলিয়াছিলেন,—ত্রিবেদী মহাশয় কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে, ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে 'Intellectual Orphan' হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বক্তার ভাষায় বলিতে হয়, আমরা 'Intellectual Orphan' নহি। আমাদের নিজের বুদ্ধি, নিজের ভাষা আছে। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও সমগ্র জগৎকে জ্ঞান বিতরণ করিতে পারে, আমাদের ভক্তিসিন্ধু এখনও জগতের সমগ্র ভক্তবৃন্দকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিতে পারে।

———০———

লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-পরিষদের সংস্রবে আমার রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমি যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় সদ্ভাবসম্পন্ন সাহিত্যানুরাগী, দেশহিতৈষী, সুবিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি আমি তাহার পূর্ব্বে তেমন-ধারা অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম।

তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল—সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তাশীলতা। তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ, সুমধুর ও অকৃত্রিম সৌজন্য এখনও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে, তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

তিনি যাহা কিছু বলিতেন বা লিখিতেন, তাহা তাঁহার অকৃত্রিম হৃদয় হইতে বাহির হইত এবং তাহা সকলই সার-গর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার অমায়িক সরল স্বভাব সকলেরই প্রীতি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত।

শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নহে, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি-দিগের আদর্শস্থানীয়।

তাঁহার বিষয়ে আমি কত আর বলিব? তিনি যাওয়াতে আমাদের দেশের সাহিত্য-গগনের একটি মহোজ্জ্বল তারকা অস্তমিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত আমার প্রীতির বন্ধন আমি যেরূপ প্রগাঢ়রূপে অনুভব করিতাম, তাঁহার অবর্ত্তমানে সে স্থানটি আর কিছুর দ্বারা পূরণ হইবার নহে। তাহা হৃদয়ের বস্তু,—মুখে বা লেখনীতে প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

---

(১০)

লেখক—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্

ক

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের শেষ রচনা। এর সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন এবং আমরা, তাঁর শ্রোতারা, সমস্ত স্থানোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হ'য়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। শুনেছি, এই ঘটনাটি আমাদের দেশের দু'একজন যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তার বাহিরের 'দীঘির পাড়' বলে বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিদ্যার আলয়ের উপযুক্ত কি না, এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরসন-কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করুক আর নাই করুক, এই ব্যাপারটি রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-সৃষ্টির একটি মর্ম্ম-কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন, পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোন দেশেই সুলভ নয়। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ ও বেদাঙ্গ—এ দু'য়ের সঙ্গে কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগূঢ় যোগ ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এ বিদ্যাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বহন করতেন। কারণ, এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেদ-বেদাঙ্গ সবই ছিল তাঁর সতেজ ও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্য তাঁর লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে

বাহনমাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'সুন্দর হাস্তে' উদ্ভাসিত, তাঁর চিরনবীন 'সুন্দর হৃদয়ে'র 'মাধুর্য্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল, জড়বিজ্ঞান এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন্ কোন্ মহলের দরজা খুলেছে এবং কোন্ প্রাসাদে রাজ-কন্যারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাঙছে, সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্যনিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড এবং তার আচার্য্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কতটা অধিকার করেছিলেন, হেলম্‌হোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও বিজ্ঞান-প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্যসাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে; মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাঁকে সমস্ত রকম অনুদারতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেচে।

আধুনিক প্রাণি-বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্‌ম্যান, ডিভ্রিস্, ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবুক মন তাতে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত

হয়—তিনি পরম কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল, কুয়াসাহীন দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায়ু জীবনের শেষ ভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তা ও সাহিত্যের রস, প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ্ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক-সম্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিই 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল—আমাদের নিত্য ঘরকন্নার ব্যাবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ এবং অধ্যাত্ম জ্ঞানের ও পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতের যে মূর্ত্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, অল্প-বিস্তর মেজে ঘষে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেন না, সে কাজই হল, এই ব্যাবহারিক জগতের বস্তু ও ঘটনার স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে, তাদের সমাবেশে জগতের যে মূর্ত্তিটি গড়ে' ওঠে, সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যাবহারিক জগতের মূর্ত্তি নয়। যে মূলের টীকা আরম্ভ হল, টীকা শেষ হ'লে দেখা গেল, সে মূলই নেই। ফলে ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্বন্ধটা কি এবং এই দুই কল্পিত জগতের কোন্ অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে

যেমন কঠিন, তেমনি কৌতূহল-কর। ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে পারমার্থিক সত্যের সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগৎটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও ঘোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্ব্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি বাঙ্গালা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্যার অধিক সূক্ষ্ম, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা য়ুরোপেরও কোনও দেশের ভাষা দেখাতে পারবে কি না, সন্দেহ করা চলে। কেন না, আধুনিক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চ্চায় যে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রসুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে, বর্ত্তমান য়ুরোপের সারস্বত-সমাজেও তা সুদুর্লভ। আমাদের দুর্ভাগ্য, রামেন্দ্রসুন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খ

৺ রামেন্দ্রসুন্দরের সব স্মৃতি-সভাতেই বক্তারা তাঁর স্বদেশ-প্রীতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি, তার পক্ষেই বেশীক্ষণের জন্য দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্বদেশ-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যথা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্ম্মান্তিক ছিল, তাঁর লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও যাঁর পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদের স্বভাবতই চেষ্টা হবে—উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্ত্তমানকে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া। রামেন্দ্রসুন্দর, লোকে যাকে কাজের লোক বলে, ঠিক তা ছিলেন না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্ম্মকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না, তাঁর প্রকৃতিতে সে রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার জগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাফেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশপ্রীতি এক জায়গায় তাঁর এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কাজে তিনি অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এর জন্য অকাতরে নিজের সময় ও স্বাস্থ্য দান করে' গেছেন। মনে হয়, এ না হলে তিনি হয় ত জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের যে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা করতেন, তার কাজের আহ্বান রামেন্দ্রসুন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নি।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা, বোধ হয়, আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন, যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেই। তাঁরা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতার গৌরব করেন না, এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন এক রাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে (প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে, কেন না, ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায়, তাতে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এর অবশ্য এক কারণ—রুচির প্রভেদ, মানুষের সকল বিষয়েই যখন রুচির তফাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভ্যতার বেলাতেই দেশের সকলের রুচি এক হবে, এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর নিঃসন্দেহ প্রধান কারণ—আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের

পরিচয়ের একান্ত অভাব। যে একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি, সে হ'ল আধুনিক য়ুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্ত্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল, তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রলুব্ধ করবে, এতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের, য়ুরোপেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন—মানুষের সভ্যতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য। সেই জন্য চোখের সামনে আছে বলেই বর্ত্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রীতিমান্ ও গভীর শ্রদ্ধাবান্ হয়েছিলেন। অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র, সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেই জন্য ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে খৃষ্টির ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে, অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁট করে' দাঁড়াতে হবে না। কেন না, তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন, যে ভারতবর্ষ বেদ ও উপনিষৎ সৃষ্ট করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে জন্ম দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার ঋষি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনও বিদ্যাকেই উপেক্ষা করে নাই; যে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিগ্বিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রব্রজ্যা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি তাঁর

স্বদেশবাসীকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল, তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বাঙ্গালা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', তাঁর বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁর শক্তিকে বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন, তাতে ব্যবস্থা অন্যরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল-মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা কেমন মূর্ত্তি ধারণ করে, তা আমরা জানি এবং রুদ্ধচক্ষু শ্রদ্ধার কাছে তার কি লাঞ্ছনা, তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল, চক্ষুষ্মান্ ও পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি মূর্ত্তি বিরাজ করে, রামেন্দ্রসুন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার যবনিকা পড়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

---

(১১)

লেখক—শ্রীযুক্ত জলধর সেন

আমাদের ত্রিবেদী মহাশয়ের যিনি 'নামকরণ' করেছিলেন, তিনি কে, সে খবর আমি জানি নে; কিন্তু তিনি যেই হোন, তিনি যে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ছিলেন, আর তাঁর যে সৌন্দর্য্য-বোধ বেশী মাত্রায় ছিল, এ কথা আমি হলফ্‌ করে বল্‌তে পারি। 'রামেন্দ্র' নামের সঙ্গে 'নাথ', 'নারায়ণ', 'প্রসাদ' প্রভৃতি যোগ ত অশোভন হ'ত না; কিন্তু যিনি নামটী রেখেছিলেন, তিনি ছেলের ভবিষ্যৎ দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন; তাই আমাদের ত্রিবেদী মহাশয়ের নাম—রামেন্দ্রসুন্দর!

রামেন্দ্রসুন্দরের, বল্‌তে গেলে, সবই সুন্দর ছিল। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য—সুন্দর, তাঁর রচনা—সুন্দর; তাঁর কথা—সুন্দর; তাঁর ব্যবহার—সুন্দর; তাঁর অমায়িকতা, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর সাহিত্য-সাধনা—সবই সুন্দর! তিনি সেই রামেন্দ্রসুন্দর!

এই বয়সে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, কত জন দেখিলাম, কত জনের সঙ্গে মিশিলাম; কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসরের বালক একমাত্র দেখেছি রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর জীবনটা আগাগোড়াই বালকের মত;—বালকের মত তাঁর হাসি, বালকের মত তাঁর ব্যবহার, বালকের মত তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে বস্‌লে পাণ্ডিত্যের সামান্য ঝাঁজও গায়ে লাগত না; বড় বড় অনেক তত্ত্ব তাঁর কাছে শুনেছি,—কিন্তু তিনি সেগুলি বলে গিয়েছেন একেবারে বালকের মত। কোন স্পর্দ্ধা ছিল না, কোন অভিমান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন প্রাণ-খোলা মানুষ; কোন দিন তাঁকে পোষাকী মানুষের মত দেখি নাই—সব সময় আটপৌরে!

রামেন্দ্রসুন্দরে কি 'অসুন্দর' কিছু ছিল না ?—ছিল বই কি ! রামেন্দ্রের হাতের লেখা ছিল অসুন্দর ; যখন তিনি তাড়াতাড়ি লিখ্‌তেন, তখন কার সাধ্য যে গলদ্‌ঘর্ম্ম না হয়ে সে লেখার পাঠোদ্ধার করে। আর 'অসুন্দ'র হয়েছে তাঁর এমন ক'রে অকালে চ'লে যাওয়া। তাঁর 'সাহিত্য-পরিষদের' কাজ অসম্পূর্ণ পড়ে রইল, তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নগুলো টেনে বার করা হোলো না, তাঁর 'জগৎ-কথা' অসমাপ্ত রইল, তাঁর শত সহস্র ভক্তিমান্ শিষ্য তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, আর তিনি কি না দেনা-পাওনা না মিটিয়ে, কাউকে কিছু না ব'লে অকালে চলে গেলেন। এইটিই রামেন্দ্রসুন্দরের সর্ব্বাপেক্ষা অসুন্দর !

সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত আমার কাছ থেকে রামেন্দ্র-সুন্দরের কথা শুন্‌তে চেয়েছিলেন ; আমি তাই, এই কয়টী কথা বল্‌লাম,—এর বেশী আমি বল্‌তে জানিনে ;—রামেন্দ্রসুন্দরের কথা সুন্দর ক'রে বল্‌বার সামর্থ্য আমার নেই। তাঁর জীবন-কথা ধ্যান করতে হয়—বল্‌তে পারা যায় না—অন্ততঃ আমি ত পারিনে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

৺রামেন্দ্র বাবুর হাতের লেখা ও স্বাক্ষর

(১২)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ

বেশী দিন হয় নাই, তিন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুতে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেন, "ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ আছে ; বেশ কথা। এক দিন আমিও থাকিব না, আপনারা থাকিবেন।" * কিন্তু তিনি এত শীঘ্র যে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা তখন মনে হয় নাই। তিনি কয়েক বৎসর হইতে নানারূপ পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার অকাল-বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছিল। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার তিনি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে বার যদি বা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন, বড় বেশী দিন আর তাঁহাকে আমাদের মধ্যে রাখিতে পারিলাম না। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি ভবধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধন-গোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র, জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমো গ্রামে বাস করেন। বলভদ্রের পৌত্র গোবিন্দসুন্দর প্রতিভায়, চরিত্রে, তেজস্বিতায় ও দেশানুরাগে সে অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পূজিত ছিলেন। ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর। †

'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর যেটুকু আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, তদবলম্বনে আমরা প্রায় তাঁহারই ভাষায়, সংক্ষেপে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

---

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ১৩২৩ বৈশাখ, ৩৬৫ পৃঃ।

† 'বঙ্গভাষার লেখক' হইতে সঙ্কলিত।

রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন, ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতিও ভক্তি করিতে তিনি শিখিয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ও গণিতে তাঁহার পিতার অসাধারণ অধিকার ছিল—বাল্যকালেই রামেন্দ্রসুন্দর তাহার ফলভাগী হইয়াছিলেন। পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতেন। ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ার তাঁহার সখ হইয়াছিল। পরে তিনি কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় যদিও তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন, তথাপি উক্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ বৃত্তিলাভ করেন। তখন তাঁহার সতেরো বৎসর বয়স। অতঃপর পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের সহিত তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তিনি পাঠ্য পুস্তকে বেশী মনোযোগ না দিয়া, বাহিরের বহি (ইংরাজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতেন। ফলে এফ্‌-এ পরীক্ষায় তাঁহাকে দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। এণ্ট্রেন্স হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় তিনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান ও ৪০৲ বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে 'নবজীবনে' তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে এম্‌-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হন। রসায়নের অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেব তাঁহার একটি ক্লাস এক্সারসাইজ্‌ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তখন হইতেই তাঁহাকে প্রেমচাঁদ-বৃত্তি-পরীক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় পেড্‌লার সাহেব

রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। ঐ পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দরের কাগজ সম্বন্ধে তিনি নিজ ক্লাসে বলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই Out and out the best." কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার বলেন,—"out and out the best." ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম্-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম স্থান ও পর বৎসর প্রেমচাঁদ-বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় তাঁহার সম্বন্ধে পরীক্ষকগণ এইরূপ মন্তব্য দিয়াছিলেন,—"The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has yet taken up these subjects at this Examination." পরে দুই বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পদত্যাগ করিলে, রামেন্দ্র বাবু ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত এই পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শুধু বিজ্ঞানেই যে তাঁহার মনীষা স্ফূর্ত্তিলাভ ও আত্মবিকাশ করিয়াছিল, তাহা নহে। দর্শনে, ইতিহাসে ও বৈদিক সাহিত্যেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া মদীয় অগ্রজের সহিত যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, তাহার কিয়দংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। * সমাজ, ধর্ম্ম, পুরাণ ও ইতিহাস লইয়া এই সকল প্রসঙ্গে তিনি যেরূপ গবেষণাপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর এবং বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে একমাত্র ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ব্যতীত অপর কেহ এরূপ শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বৈদিক-যজ্ঞ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার

* 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'—অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত-প্রণীত।

জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা 'সাহিত্য'পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতিসাধনচেষ্টা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, 'এই প্রার্থনা।" তাঁহার এ প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্য-সাধনায় একাগ্রভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। এক দিকে যেমন তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যে ও চিন্তাশীলতায় অতুলনীয়, অপর দিকে তেমনই আবার তাঁহার ভাষার ভঙ্গি, লালিত্য ও প্রসাদগুণ অননুকরণীয়। কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়সমূহ তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদরূপে বুঝাইতে পারিতেন। এ শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। 'প্রকৃতি', জিজ্ঞাসা', 'চরিতকথা', 'কর্ম্মকথা' ও 'শব্দকথা' এই কয়খানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় এখনও বিরাজ করিতেছে। দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া 'ভারতবর্ষে' তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি প্রকাশ্য ভাবে সেরূপ যোগ দিতেন না বটে; কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি 'প্রবাসী' পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি হইতে বুঝা যায়, তিনি কত দূর দেশভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনিই জাতীয় রাখীবন্ধন-উৎসবের উদ্যোগকর্ত্তা। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী-শীর্ষক প্রবন্ধে 'মানসী'তে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আজীবন অধ্যাপনা-কার্য্যে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার এই ধারণাই

বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আধুনিক যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের একেবারে উপযোগী নহে, ইহা দেশের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এই দেশে পূর্ব্বে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা দেহের ও মনের ধ্বংস সাধন না করিয়া স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করিত। তাহারই পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কলেজ-ক্লাসে ছেলেদের বাঙ্গালায় অধ্যাপনা করিতেন।

আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সকল রত্ন উপহার দিয়াছেন, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার অবসর আজ হইবে না। আজ শুধু এই কথা বলিয়াই আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে যে, ভূদেব, গুরুদাস প্রভৃতি পুণ্যচরিত মনীষিগণের ন্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বদেশব্রত, আদর্শ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার মধুর সরল প্রকৃতি ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

---

(১৩)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আত্মা অনন্তের সন্ধানে প্রয়াণ করিয়াছে; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, রামেন্দ্রসুন্দরের সুন্দর, আদর্শ জীবনের কল্যাণময়ী চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাদের জীবনে কল্যাণের অমৃত-ধারা বর্ষণ করুক।

রামেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ অকালে একজন মনস্বী, কৃতী ও প্রতিভাবান্ সন্তান হারাইল। তিনি আপনাকে দেশের কল্যাণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও সাধনার মধ্যে শুধু একটি সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণ। তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও জননীর আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কোনই পুরস্কার ছিল না। তিনি যে আত্মত্যাগ-রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রাচীন কালের নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদবিদ্যাভূয়িষ্ঠ, যজ্ঞপরায়ণ, ব্রাহ্মণগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাচীন ভারতের দেবতাকল্প ঋষিদিগের মত শান্ত ও আচারনিষ্ঠ, ঋষিদিগের মত ধীর ও ক্ষমাশীল, ঋষিদিগের মতই উদার ও জ্ঞানী, রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশের আদর্শ উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া, স্বদেশের সমসাময়িক চিন্তাপ্রণালীর উপর মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়া, জীবনের অপরাহ্নে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন! তাঁহার অবিনাশী, অনন্ত, কল্যাণকামী আত্মা, অকালে জরাগ্রস্ত, অপটু দেহপঞ্জরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কোন্ কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছে। আর আমরা রহিয়াছি, তাঁহার জীবনীকথা স্মরণ করিয়া সম্মানের, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দুই-এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবার জন্য।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কি চলিয়া যাওয়া ? এ কি মৃত্যু ? যিনি যে 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতম্ অশ্নুতে'—তিনি যে বিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইলেন, সে কি শুধু তাঁহার নিজের জন্য ? অবিদ্যা অন্ধকারের যাত্রী, অজ্ঞানের ধাত্রী ও স্বার্থের বাহিকা, সেই জন্যই অবিদ্যা মৃত্যুর সেতু ; বিদ্যা আলোকের বর্ত্তি, জ্ঞানের মূর্ত্তি, এবং পরার্থ-সাধিকা। রামেন্দ্রবাবু এই বিদ্যার আরাধনা করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। গগনবিসর্পী বনস্পতি যখন ভূমিতে কলেবর রক্ষা করে, তখনই তাহার জীবনেতিহাসের পরিসমাপ্তি হয় না। সে তাহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কত পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গকে ছায়া ও আশ্রয় দান করিয়া, তাহার বৃক্ষজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে, এবং তারপর যখন সে বিগত-জীবন হয়, তখনও তাহার পত্র-পুষ্প-জল ভূমির সহিত মিশিয়া অসংখ্য বনস্পতির অভ্যুদয় সম্ভাবিত করিয়া দেয়। পরে হয় ত সেই বনস্পতির কঙ্কাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিয়া এমন উপাদানে পরিণত হয়, যাহা উপযুক্ত সুযোগের সহযোগে বিশুদ্ধ আলোকচ্ছটায় বিশ্বজগৎ মুগ্ধ করিতে পারে। তেমনই মহাপুরুষেরা জীবিতকালে অসংখ্য কল্যাণ সাধন করিয়া, মরণেও আত্মার দিব্যদ্যুতি বিকিরণ করিতে বিরত হয়েন না। শিশুরা মনে করে যে, মরণের পরে লোকে নক্ষত্র-তারকা-রূপে গগনাঙ্গনে বিরাজ করে। এই শৈশব-কল্পনার মধ্যে যে কোনও সত্য প্রচ্ছন্ন নাই, তাহা কে বলিতে পারে ?

দেশবিশ্রুতকীর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই তাঁহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই। তাঁহার 'কর্ম্ম-কথা', 'চরিত-কথা', 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' কাল-সমুদ্রের কতগুলি লহরী-লীলায় 'কমলে কামিনী'র ন্যায় রূপ বিকাশ করিবে, তাহা গণনা করা অসাধ্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রামেন্দ্র বাবুর মনীষা ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি যে মহতী

প্রতিভার প্রেরণা জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জ্ঞান-কর্ম্মের নানা বিভাগে সংক্রামিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, রমেশচন্দ্র-সারস্বতভবনের পরিকল্পনা যেমন স্থূলতঃ তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তেমনই বঙ্গ-সাহিত্যের আধুনিক উন্নতির ধারা তাঁহারই গৌরব-বাণী প্রচার করিতেছে।

মহাপুরুষেরা সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যান, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের মহত্ত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। সে প্রভাব আমাদের সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠীতে পরিমিত হইতে পারে না। কারণ, এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ বাহিত হয়। রাশীকৃত গ্রন্থ প্রণয়ন অপেক্ষাও এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা মহত্তর কার্য্য এবং মহত্তর কার্য্যই রামেন্দ্রবাবুর প্রতিভার দ্যোতক। সাহিত্য-পরিষৎ ও সম্মিলনের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে একটা বিরাট জাগরণের সূত্রপাত বাঙ্গালীর জীবনে অধুনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রযোজকদিগের মধ্যে রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। এই যে মাতৃভাষার মরা গাঙ্গে বান আসিয়াছে, ইহার গতি রোধ করা আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বিস্মৃত, অনাদৃত মাতৃভাষার স্থির সলিলে তুফান তুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকাহিনী।

বস্তুতঃ সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আজকাল একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব গিয়া পৌঁছিয়া পুরাতন-নূতনের একটা ওলট্‌পালট্ বাধাইয়া দিয়াছে। অসম্ভব, সম্ভব হইতে বসিয়াছে; অনভ্যস্ত, চিরাভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তিত হইবে? আজকাল বাঙ্গালী ছাত্র আর ইংরেজির বাঁধি বুলিতে তুষ্ট হইতে চাহিতেছে না। তাহারা খাঁটি মাতৃ-

ভাষার মাঙ্গলিক শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছে। হয় ত অচিরে ইংরেজি ছাড়িয়া অধ্যাপকেরা বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিবেন। উচ্চ-শিক্ষা, মধ্য-শিক্ষা ও নিম্নশিক্ষা সর্ব্বত্রই বঙ্গবাণীর কোমল হস্ত দেখিতে পাইব। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ভবিষ্যতে এই বর্ত্তমান যুগের যে অধ্যায়টি লিখিত হইবে, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

বঙ্গবাসীর অন্তর রাজ্যের উপর রামেন্দ্র বাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব বড়ই পবিত্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে ; দুরতিক্রমণীয় বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান, নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। এটিলা বা তৈমুরলঙ্গেরও যে প্রতিভা ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে লোকক্ষয়করী এবং দেশধ্বংসকরী প্রতিভা দেবতার অভিসম্পাত-স্বরূপ দেখা দিয়াছিল, তাহা কোনও স্থায়ী প্রভাবই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আর যাঁহারা নিভৃত নিরালা প্রদেশে বসিয়া অন্যের অজ্ঞাতে লোকের হিত চিন্তা করিয়াছেন, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব কালের অগণিত সোপান-রাজি বাহিয়া অবিনশ্বরতার দিকে চলিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব সেই শ্রেণীর প্রভাব ছিল। তাহার মধ্যে কুটিলতার সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাত্র ছিল না এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র ছিল না, এই জন্যই তাঁহার মহত্ত্ব আমাদের অন্তর-রাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে।

মহত্ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিদ্যুদ্বিকাশই অনেক স্থলে বেশী। মহত্ত্বের এই ভেরী-নিনাদের কোলাহলে অনেক সময় প্রকৃত মহত্ত্ব চাপা পড়িয়া যায়। রামেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব এ প্রকৃতির ছিল না। এখানে ভেরী-নিনাদ ত ছিলই

না ; বরং অপরের ভেরী-নাদও তাঁহার নিকট লজ্জা পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। শিশুর ন্যায় সরল, শিশুর ন্যায় পবিত্র, সদা শুভ্র হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল—এ সকলই তাঁহার শিরে দেবত্বের মুকুট পরাইয়া দিত। তাঁহার হাসিতে সমস্ত হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া পড়িত, কোথাও এতটুকু মলিনতা বা প্রচ্ছন্নতা থাকিতে পারিত না। তাঁহাকে শুধু হাসিতেই দেখিয়াছি। অসুখের সময়েও তাঁহাকে কখনও বিমর্ষ হইতে দেখি নাই ; একটু কথা কহিতেই তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যোচ্ছল ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িত। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ ভাবটি অনেকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। রামেন্দ্রসুন্দরের সৌন্দর্য্য তাঁহার আধ্যাত্মিক পবিত্রতার বহির্লক্ষণ ছিল।

প্রতিভার সহিত পূত চরিত্রের, কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত অবারিত আনন্দের অবাধ শুভ সম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এইরূপ চরিত্রই বঙ্গদেশে সর্ব্বকালে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাই আমাদের সর্ব্বকালের আদর্শ। আমাদের জাতীয় চরিত্র এইরূপ আদর্শেই গঠিত হইয়া আসিয়াছে। ইউরোপ অবতারবাদ মানে না। কোন্ সুদূর অতীতে, এক তুষার-মণ্ডিত দেশে নরদেবতা ওডিন্ দেবত্বের সম্মান পাইয়াছিলেন। তারপরে আর মানুষকে সে দেশে ভগবানের আসনে বসায় নাই। গ্রীসের দেবতারা কবিকল্পনামাত্র। সৌন্দর্য্যের, আনন্দের, শক্তির রূপকে গ্রীকদেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। যীশুও ঈশ্বরপ্রেরিত মানব। কিন্তু আমাদের দেশে নরনারায়ণের ব্যবধান এরূপ ছিল না। আমাদের মানব বুদ্ধ, ভগবানের অবতার, স্বয়ং ভগবান্ ; আমাদের চৈতন্য-নিত্যানন্দ, আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবরূপে দেবতা। সুতরাং আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে ভেদবুদ্ধি রাখি না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদযদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

সেই বিভূতি—শ্রীভগবানের বিভূতি—রামেন্দ্রসুন্দরের লোকবিলক্ষণ

চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার চিন্তা—সে পবিত্র চরিত-কথা যতই আমরা চিন্তা করিব, ততই আমাদের উপকার হইবে, সমাজের উন্নতি হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে।

রামেন্দ্রবাবুর স্বদেশভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্যের শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়াই দেশের উন্নতি কামনা করিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে, ব্যবসায়বাণিজ্যের দ্বারা দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা হইতে পারে—কিন্তু সমস্ত উন্নতির সারভূত, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জ্ঞান ও চরিত্র সমস্ত মঙ্গলের আকর, ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক যত্ন ও সাধনার দ্বারা তিনি সেই দিকে উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলেজের অগণিত ছাত্র ও অধ্যাপকের নেতৃস্বরূপে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবক-স্বরূপে তিনি দেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি করিতেই আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তিনি দেশের অকল্যাণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন না। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি যে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক। আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বন্দে মাতরম্"। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্লেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশ্লেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্তে লাগ্লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্তে লাগ্ল। লোকের

গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।"

তার পরেই দুর্দ্দিন আসিল; সেই দুর্দ্দিনের মধ্যে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। তাই রামেন্দ্রবাবু আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের জন্য বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা রচনা করিলেন। এবং তাঁহাদের মুখ দিয়া বলাইলেন :—

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকৃতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকৃতে চুড়ি পর্‌বো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো।। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা স্বদেশ-প্রেম ও ভাষার সরলমিষ্টতা হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়! রামেন্দ্রবাবুর অনুকরণ করিয়া আমরাও বলি—বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয় সন্তানের স্মৃতির উপর ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

---

(১৪)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ

(ক)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শুধু যে আমাদের দেশের একটা বিষম ক্ষতি হইল, তাহা নহে; সমগ্র মানব-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম,—'আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনার এখন মৃত্যু হলে চল্‌বে না। "ভারতবর্ষে" প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিষ গড়ে তুল্‌চেন, তা' এই সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ কর্‌তে পার্‌বে না; সে জিনিষ অসমাপ্ত রেখে আপনার সরে পড়া চল্‌বে না।' আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি যেন মৃত্যুঞ্জয়-ললাট-বহ্নির মত আসন্ন মৃত্যু-কালিমাকে অপসারিত করিয়া, প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধরের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা যেন দেখা দিল। তাঁহার হাস্য সুন্দর, তাঁহার বাক্য সুন্দর, হায়! রামেন্দ্রসুন্দর!

"বিচিত্র প্রসঙ্গে"র কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, বল দেখি, এই ব্যায়ারামের মধ্যে যখন সমস্ত দেহ-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন?" উৎকট রোগের মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বিচিত্র-প্রসঙ্গের কথা শুনিয়া লইয়াছিলাম, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য সুন্দর, সর্ব্বজন-প্রিয় তিনি, মাধুর্য্য-ধারায় তাঁহার বন্ধুগণের চিত্ত-লোক অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম,—'ভারতবর্ষের Series-এর মধ্যে আপনি যেখানে এসে

দাঁড়িয়েছেন, সেটা ত একটা Jumping-off ground; একটি লাফে আপনি বেদান্ত-তত্ত্বের মাঝখানে গিয়ে পড়্‌বেন। এমন করে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পন্থাগুলি অবলম্বন কোরে সটান বেদান্তের সিংহদ্বারে এসে পৌছান—এটা যে সম্ভবপর হ'তে পারে, বোধ হয়, কেউ কখনও ভাব্‌তে পারে নি। এত দিনে এ কাজ শেষ হ'য়ে যেত; কিন্তু আপনি বৈদিক-যজ্ঞ নিয়ে পড়্‌লেন, হুড়মুড় কোরে অতগুলো প্রবন্ধ রচনা কর্‌লেন। মজা এই যে, ও-প্রবন্ধগুলিও আপনি ছাড়া আর কেউ লিখ্‌তে পার্‌তেন না। বিচিত্র-প্রসঙ্গের সময় আপনার চিন্তা-তরঙ্গ যে দিকে বেগে যেতে আরম্ভ কর্‌লে, ঐ বৈদিক প্রবন্ধগুলি ঠিক যে তার পরিণতি, তা নয়,—ওর পরে আরও আপনার বল্‌বার অনেক ছিল;—যজ্ঞের ভিতরকার কথাও বলা বাকী রয়েছে; সে কথা আপনাকে বল্‌তে হবে। কিন্তু ঐ Jumping-off groundএর কথা কিছুতেই ভুল্‌তে পারি নে।' রামেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"দেখুন, কত দূর কি হয়। সে বার ত সেরে উঠ্‌লুম, এ বার কি হয় দেখুন। ঠিক বলেছেন, বেদান্তে নামি নামি করে এখনও নেমে পড়িনি;—সব গুছিয়ে এনেছি।' সব গুছিয়ে এনেছেন! রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না। আজ সে মুখ চিরদিনের জন্য মৌন হইয়া গেল।

তিনি কি কি কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার হিসাব করিতে বসিলে, আক্ষেপের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে তাঁহার মত স্বাধীন চিন্তয়িতা অত্যন্ত বিরল। স্বদেশের অতীত ইতিহাসের কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। "ভারতবর্ষে"র পুরাতন 'ফাইল' যাঁহারা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্ম্মকথাটুকু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনা তাঁহার ছিল; কিন্তু মধ্যপথে

হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন। এই দ্বিতীয় স্তবক 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র রচনার ভাষা আমার বটে, কিন্তু সমস্ত মাল-মসলা তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক ভাবে নিজের বক্তব্য ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতেন। আমি তাঁহার পদ-প্রান্তে বসিয়া, অবহিত চিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, নোট করিয়া লইতাম।

বাল্যকাল হইতে তিনি ইতিহাস পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি গ্রীন্, হিউম, গীবন-রচিত বড় বড় ইতিহাস পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার কান্দি স্কুলে অধ্যয়ন হইয়াছিল বলিয়া, 'গণ-দর্পণ'-রচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি এবং আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। এই রাম-জানকীর অপূর্ব্ব সম্মিলনে রিপণ কলেজ কিছু দিন পরে ধন্য হইয়া গেল। সাতাশ বৎসর পরে জানকীর হাতে কলেজের সমস্ত ভাল-মন্দ-ভার অর্পণ করিয়া রাম চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক-সঙ্ঘ আর কি পূর্ব্বের মত সাহিত্য-চর্চ্চায় আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখনই তাঁহাকে চিঠি লিখিতেন, তখনই তাঁহাকে 'সাহিত্য-পরিষদে'র একমাত্র "সারথী" বলিয়া অভিহিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথও এই সারথ্যের কথা, বেশ জোরের সহিত তাঁহার অভিনন্দন-পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র বাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, রামেন্দ্রবাবুকে শয্যা-পার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন,—"রামেন্দ্রবাবু, এ বার আমি বোধ হয় বাঁচব না। সাংখ্য-বেদান্তের কাছে জর্ম্মন-দর্শনের ঋণের কথাটা ত এখন আমার শেষ করা হোল না; আমি না থাকলে কে আর ও সব কথা লিখবে?" আমাদের দেশের

সৌভাগ্য যে, অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রোগ-মুক্ত হইয়া, তাঁহার মানস-প্রসূত রত্নরাজিতে বঙ্গ-সাহিত্য অলঙ্কৃত করিতেছেন। আর গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। এত দিন তাঁহার মনে অনেক বিষয়ে সংশয় ছিল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, Legality ও Morality ইত্যাদির গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে তিনি উপনিষদের স্তরে উঠিয়া খানিকটা হাল্কা বোধ করিলেন। কলেজের অবসর-কালে, কথাপ্রসঙ্গে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কথা আছে, পুরাণে কিংবা অন্য কোথাও ঐ ঋষির নাম পাওয়া যায় কি? তিনি যে দেবকী-নন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিলেন, সেই দেবকী-নন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার বাসুদেবের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন,—'অন্য কোথাও ত ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নামের উল্লেখ পাই নাই; তবে আমি কিন্তু ঐ দেবকী-নন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাব। মনে রাখিবেন—"উপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ"; এক দিন আমি ঐটে অবলম্বন কোরে Legality ও Moralityর মূল সূত্রে পৌঁছাবার চেষ্টা কর্‌ব। বেশ বড় কোরে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে।' দুএক স্থলে অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ব্যতীত ভাল করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই লেখা হইল না।

এমন অনেক জিনিস তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু লেখা হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার জন্য আগ্রহ তাঁহার খুব বেশী ছিল। রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺নিখিলনাথ মৈত্রেয় যখন রামেন্দ্র বাবুর একটি প্রবন্ধ জর্ম্মন ভাষায় অনুবাদ করিয়া, পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিবার জন্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, তখন জর্ম্মন ভাষানভিজ্ঞ রামেন্দ্র বাবুর সকৌতুক চাহনি দেখিয়া, আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল।

জর্ম্মনির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় অনুবাদটি প্রকাশিত হইলে পর, উক্ত পত্রিকার পরিচালকবর্গ অনুবাদকের নিকট পঁচিশ কাপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়কে আগাগোড়া জর্ম্মন ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। তাহাও হইল না। তাঁহার বিষয়ে লিখিতে বসিয়া কেবলই মনে পড়ে, কত কি হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু হইল না।

(খ)

রামেন্দ্র বাবুর লেখার অভ্যাস বড় কমিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে যদি বলিতাম, একটা ভাল করিয়া কিছু লিখুন, তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন,—"লিখ্‌ব কি ? সব কথাই ত কেউ না কেউ বলে ফেলেছে ; নতুন করে বলবার কিছু আছে বলে ত মনে হয় না।" কিন্তু এমন দিন আসিল, যখন তাঁহার এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে একটু লজ্জিত করিতে পারিয়াছিলাম।

প্রতিভার বিদ্যুৎ চমকাইল ; কিন্তু ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে। যখন তিনি অনর্গল নূতন কথা শুনাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় রোগশয্যায় শয়ান ! এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, যখন শরীর ভাল ছিল, তখন ভাবতাম, সব কথাই বলা হয়ে গেছে, কেউ না কেউ বলে ফেলেছে। এখন এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্চে, আমিও কিছু নতুন কথা বল্‌তে পারতাম। অনেক পড়েছি ও ভেবেছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্চে, কতকগুলো ইতিহাসের ও দর্শনের সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারি। তাই যেন একটু আপ্‌শোষ হয়।" তাঁহার সে আক্ষেপ স্থায়ী হইতে দিলাম না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে প্রথম স্তবক 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' কাহিনী শুনিয়া লইলাম। সেই সমস্ত মালমসলা লইয়া, আমি নিজের ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়া, যথাসম্ভব মার্জ্জিত করিয়া "মানসী"তে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য রচনা যখনই তিনি পাঠ করিতেন, তখনই তিনি আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। ঐখানে তাঁহার সঙ্গে আমার বড় মিল হইত। তাঁহার সতীর্থ, আবাল্যসুহৃৎ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিশ্রম্ভালাপে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"কি হে, পয়ার হচ্চে না কি ?" বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের নামে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে তিনি রবি বাবুর 'পতিতা' পড়িয়া আনন্দের আবেগে কবিবরকে একখানা বেনামী পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। হু হু করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া, যে দিন ত্রিবেদী মহাশয়ের প্ররোচনায় তিনি 'অভয়ের কথা' লিখিয়া "মানসী"তে প্রকাশ করিলেন, সে দিন বোধ হয়, বাঙ্গালা-সাহিত্যসেবীরা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, বেদান্ততত্ত্ব কেমন সরস করিয়া জনসাধারণকে বুঝান যাইতে পারে। রামেন্দ্রবাবুর গৃহে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিকের বৈঠক বসিত; তাঁহারা নিজ নিজ প্রবন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়কে না শুনাইয়া ছাপাখানায় পাঠাইতেন না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন সেই আসরে আমাদিগকে তাঁহার "অভয়ের কথা" ও "ঠাকুরাণীর কথা" শুনাইয়াছিলেন। রবি বাবুর 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে রামেন্দ্র বাবু যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না।

গুঞ্জরি করুণ তান, ধীরে ধীরে কর গান,
বসিয়া শিয়রে,
যদি কোথা থাকে শেষ, জীবন স্বপ্নের লেশ,
তাও যাক্ মরে—

ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিত। আজ তাঁহার ও ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পরে অতীতের স্মৃতির সৌরভটুকু লইয়া আমাদের দিন গণিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্বদেশের ও বিদেশের নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বাড়িয়া গেল। ইদানীং তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া, রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—'রামেন্দ্র বাবু কেমন করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিক তত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে বলিতে পারিতেছেন ? আমি যখন কলেজে কাজ করিতাম, তখন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম ; এখন তিনি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।'

এই শ্রদ্ধায় যখনই আঘাত লাগিত, তখনই তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন ; নিভৃতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে তাঁহার বেদনা জানাইতেন। রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে তাঁহার মতের খুব মিল ছিল ; কিন্তু সামাজিক ও পৌরাণিক অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ছিল। কিন্তু কখনও কাগজে কলমে রবিবাবুর মতের প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইত না। 'ভারত-বর্ষের ইতিহাসের ধারা' পাঠ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' প্রবন্ধও তাঁহার ঠিক পছন্দসই হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কবি অথবা বৈজ্ঞানিক হিসাবে উঁহাদিগের প্রতি রামেন্দ্র বাবুর শ্রদ্ধার তিলমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় মতের কথা বলিতেছিলাম। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, ভাঙ্গা বাঙ্গালা দেশকে জোড়া দিবার জন্য যখন প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তখন কাহার মাথায় রাখিবন্ধন ও অরন্ধনের কল্পনা প্রথম জাগিয়াছিল। একটি রবিবাবুর ও অপরটি রামেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত। রবিবাবুর, রামেন্দ্র বাবুর ও হীরেন্দ্র বাবুর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সে সময়ে কেমন করিয়া স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত হইবার জন্য মিলিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে। একটি নূতন ‍ন রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের

আনন্দ সম্পূর্ণ হইত না, যদি তাহা অচিরে রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি না শুনাইতে পারিতেন। আবার রবিবাবুর উত্তেজনায় রামেন্দ্র বাবু যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটী Classic বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত; কিন্তু কেন জানি না, তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ কমিশনর রামেন্দ্র বাবুকে পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। রবি বাবুর সে সময়ের অনেক গানও আর শোনা গেল না। এমনি করিয়া ভাল-মন্দের ভিতর দিয়া, সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীকে সত্যের পথে, ঐক্যের পথে লইয়া চলিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু বলিতেন যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব Movementএর পরে বাঙ্গালা দেশে এমন ভাব-বিপ্লব বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। সেই জাতীয় জাগরণের উৎসবে তাঁহার শক্তিকে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে ব্যাকুলতা ছিল, তাহা তিনি কাহারও নিকটে গোপন করিতেন না। প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন তাঁহার স্বগ্রামে গৃহে গৃহে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পঠিত হইত। পুস্তকখানির প্রচার বন্ধ হইয়া গেলে অনেকেই একটা মস্ত অভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

যজুর্ব্বেদান্তর্গত মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী জিঝোতীয়ব্রাহ্মণ-বংশীয় রামেন্দ্রসুন্দর যে যৌবনের শেষাশেষি হইতে একেবারে বৈদান্তিক হইয়া গিয়াছিলেন, এইটাই সব চেয়ে মজার কথা। দেখিতেছি, তাঁহার পিতা উপেন্দ্রসুন্দরও যৌবনেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। জিঝোতীয় ব্রাহ্মণেরা কনৌজিয়া বা কান্যকুব্জ-শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ইহাঁদের সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"ফতেসিংহ মধ্যে যে কয়েক ঘর জিঝোতীয়া আছেন, তাঁহাদের উপাধি দীক্ষিত, ত্রিবেদী (তেওয়ারি), চতুর্ব্বেদী (চৌবে), দ্বিবেদী (দুবে), বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র। জমিদারী বা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইহাঁদের জীবিকা চলে। যাজন কার্য্য সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কনৌজিয়া ও মৈথিলি ব্রাহ্মণ হইতে ইঁহারা পুরোহিত গ্রহণ

করেন। উপনয়ন ও বিবাহ ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই ইঁহারা বঙ্গদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা ও বঙ্গদেশপ্রচলিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষা ও পরিচ্ছদে এখন সকলেই বাঙ্গালী; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আচারানুষ্ঠান ভিন্ন কোন বিষয়েই পশ্চিম দেশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।" কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু ইদানীং প্রতি বৎসর কনোজি-ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র রামেন্দ্রবাবুর নিকটে আসিত। সেই হিন্দুস্থানি সমাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি দুঃখিত হইতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া বঙ্গভারতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে,—কলেজ হইতে পঠদ্দশাবসানে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোরে তুমি যাইবে কি? সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লম্বা ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছেন। তুমি তাঁহার স্থানে কাজ করিবে, আর মানমন্দিরের (Observatory) তত্ত্বাবধান করিবে। ঐ কাজে তোমার পাকা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আশা করি, তুমি অসম্মত হইবে না। এখন কোনও উত্তর চাই না; বাড়ী যাও; বিবেচনা করিয়া উত্তর দিও। আমার ইচ্ছা, তুমি ঐ কাজটি লও।" কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এই সময়ে রিপণ কলেজে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আনাগোনা করিতে লাগিল। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিলেন না।

এইরূপে তাঁহার কলিকাতায় থাকার ব্যবস্থা না হইলে সাহিত্যের অথবা শিক্ষার কিংবা পরিষদের প্রকৃতি কেমন দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন; সে আলোচনায় কোন ফল নাই। ক্রমে তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে অনেকেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাঙ্গালায় প্রবন্ধ রচনা করিতে

আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—"প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখ্‌লে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌তে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখ্‌লাম যে, আমি যে সব কথা বল্‌তে চাই, তা, ও ভাষায় চল্‌বে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গ'ড়ে তুলতে হল। আমি 'নবজীবনে' একটা লেখা পাঠিয়ে দিই; ভয়ে ও লজ্জায় তাতে নিজের নাম দিই নি। অক্ষয় সরকার কেমন করে কিন্তু আমার নাম জান্‌তে পার্‌লেন, আমাকে উৎসাহিত কর্‌বার জন্যে প্রবন্ধটি একটু মার্জ্জিত করে কাগজে বা'র কর্‌লেন। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোক চেনবার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল। দেখুন না, রবি বাবু যে ভবিষ্যতে বাঙ্গলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল কর্‌বেন, এ কথা তিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন ও "ভাই হাততালি" প্রবন্ধে সকলকে বলেছিলেন, তেমনটি বোধ হয়, বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর কেউ পেরেছিলেন কি না, সন্দেহ;— পারেন নি।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের কোনও অংশের কিছুমাত্র পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—"দেখুন, সুরেশ সমাজপতির অনেক দোষ থাকৃতে পারে; কিন্তু ওর কতকগুলো এমন গুণ আছে, যার জন্যে বাস্তবিকই আমি ওকে ভালবাসি। আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারব না, সে কেমন করে দীনেশ সেনকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দিলে। দীনেশ তখন একেবারে নিঃস্ব সহায়হীন, সামান্য স্কুল-মাষ্টার; সম্পত্তির মধ্যে তার হাতে ছিল 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' প্রথম সংস্করণের কাপিখানি। দীনেশকে সঙ্গে করে সুরেশ কল্‌কাতা সহর ঘুর্‌লে; শেষে বেলা বারটার সময় বাসায় এসে ধর্‌না দিয়ে পড়্‌ল,—বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন করে হোক, ছাপিয়ে

দিতেই হবে, নইলে সে জলস্পর্শ কর্‌বে না! একটু সবুর কর্‌তে বল্লাম; আচ্ছা হবে, ইত্যাদি কোনও কথাই সে শুন্‌তে চায় না। কি করি; তখনই বেরিয়ে গিয়ে সান্যাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে বইখানি ছাপাবার ব্যবস্থা করে বাড়ী ফির্‌লাম। সুরেশ আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেল।" রামেন্দ্রবাবু এই ঘটনাটি এমন করিয়া বিবৃত করিতেন, যেন এ ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুমাত্র ছিল না; কেবলমাত্র সমাজপতির একান্ত চেষ্টাই প্রশংসনীয়।

কত সাহিত্যিক ছোট-বড় ব্যাপারের সহিত তিনি অল্পবিস্তর জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার হিসাব নিকাশ লইবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার কুমার শরৎকুমারের কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর স্নেহার্দ্র হইয়া আসিত, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু-তারকা ক্ষণেকের জন্য স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিত;—আমার কেবলই মনে হইত, এই অগাধ অচঞ্চল বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া শরৎকুমার ধন্য হইয়া গিয়াছেন। রিপন কলেজের নবীন ও প্রবীণ অধ্যাপকদিগের মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রীতি জন্মাইবার জন্য তিনি একটি অধ্যাপকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিজে পথ দেখাইয়া, তাঁহাদের হাত ধরিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্ঘ-প্রীতি খুব ঢিলেঢালা রকমের ছিল। সঙ্ঘ নহিলে প্রথমটা পাঁচ জনকে সজাগ করার সুবিধা হয় না; কিন্তু পাছে সঙ্ঘটাই Fetish হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে তিনি কখনই কাগজে কলমে এই সঙ্ঘের জন্য কোনও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিতে দেন নাই; সকল প্রকার যন্ত্রবদ্ধ ব্যবস্থা-প্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-পরিষৎ-প্রীতির কথা তুলিয়া অনেক সময়ে তাঁহাকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করা হইত; কিন্তু যিনি অক্লান্ত ভাবে কলেজের ও পরিষদের কাজ চালাইয়া সাহিত্যসেবা করিতেন, তাঁহার লজ্জা হইবে কেন? 'আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া'—এ আক্ষেপ কলেজের

কিংবা পরিষদের হইত না ; কারণ, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রীতির ধারা উভয়ের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সেই প্রীতির কণামাত্রও যিনি পাইয়াছেন, তিনি কখনই তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

---

(১৫)

লেখক—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে আমাদের দেশের গুরুতর ক্ষতি হইয়া গেল। রোগ, শোক এবং অকালবার্দ্ধক্য ত্রিবেদী মহাশয়কে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কাজে অনেকটা অপটু করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—তিনি ত আমাদের মধ্যে ছিলেন। সুতরাং আমাদের আশা ছিল, আবার তাঁহাকে আসরে ভাল করিয়া নামাইতে পারিব।

আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাই নাই, কতকটা দূরে থাকিয়াই তাঁহাকে দেখিয়াছি। তথাপি সেই সূত্রে ত্রিবেদী মহাশয়ের চরিত্রে যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

১৯০৯ সালে রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে ত্রিবেদী মহাশয়ের এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সহিত এই লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। তৎকালে এ দেশে যে ভাবে ইতিহাসের আলোচনা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমার একটা ধারণা হইয়াছিল, বাঙ্গলার সাহিত্য-নায়কগণের মতে, প্রাচীন কালের সম্বন্ধে যেখানে যে খবর পাওয়া যায়, তাহার মূলের অনুসন্ধান এবং প্রামাণিকতার বিচার না করিয়া, ধারাবাহিকরূপে সঙ্কলন করাই ইতিহাস রচনার যথার্থ উপায়। ত্রিবেদী মহাশয়ের এবং তাঁহার শিষ্যের সহিত আলাপ করিয়া সে ধারণা কতক পরিমাণে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, এবং তাঁহাদের উপদেশমত কাজ করিতে সম্মত হই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের একটা বড় গুণ ছিল, তাঁহার উদার পাণ্ডিত্য—

ইংরাজিতে যাহাকে Broad culture বলে। আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই একটা অনুদার বা সঙ্কীর্ণ পাণ্ডিত্য আছে, যাহা অনেক সময় অনিষ্ট-কর হয়। এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, যাহা তাঁহারা জানেন না, তাহা জানার কোন মহিমা বা প্রয়োজন আছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া অপরের কাজে বাধা দেন। এইরূপ বাধা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ের এরূপ সঙ্কীর্ণতা ত ছিলই না; পক্ষান্তরে সকল প্রকার গবেষণার সহিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার অনুশীলনের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের আর একটি বড় গুণ ছিল, সঙ্ঘ-ভক্তি। শাক্যসিংহ তাঁহার শিষ্যগণকে তিনটি রত্নের শরণ লইতে বলিয়াছিলেন। সেই তিনটি রত্ন—ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ধর্ম্মের রক্ষণের এবং উন্নতি-বিধানের জন্য বুদ্ধের অবতরণের আবশ্যক। যখন বুদ্ধের অভাব হইবে, ধর্ম্ম তখন সঙ্ঘের আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে দেশে সঙ্ঘ উপাস্য-রত্ন নামে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই দেশ অনেক ক্ষেত্রে প্রায় চিরকালই সঙ্ঘের সহায়তা লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। যখন কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তখন মহৎ কার্য্যের সূচনা হয়; আর যখনই সেই মহাপুরুষের মহাপরিনির্ব্বাণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কার্য্যেরও পরি-নির্ব্বাণ হয়, ইহাও আমরা দেখিয়া আসিতেছি। মহাপুরুষের অভাবের সময় উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার একমাত্র উপায়—সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। এ কথাটা পাশ্চাত্যগণ খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই একটা সঙ্ঘ বা Institution খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সেই Institution-এর পুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন। সঙ্ঘের এই মহিমা রামেন্দ্রসুন্দর খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়া-

ছিলেন বলিয়াই আপনার দেহ মন প্রাণকে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের প্রতি তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তি ও নিষ্ঠার দিকে যদি তাকান যায়, তবে দেখা যায় যে, সে নিষ্ঠার—সে ভক্তির কোন সীমা ছিল না। এই পরিষদ্‌ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজের সাহিত্যিক জীবনে একরূপ আত্মহত্যা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়টা পরিষদের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহার অর্দ্ধাংশও যদি বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের শাখাবিশেষের অনুশীলনে উৎসর্গ করিতে পারিতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দেশ-বিদেশে বরণীয় এবং স্মরণীয় মহৎ কার্য্য করিয়া যাইতে পারিতেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের সৌজন্য এবং অমায়িকতা এ দেশে সুপরিচিত। তিনি অতিমাত্রায় অমায়িক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, শেষ পীড়ার সময় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে সম্মত হন নাই। কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক মতে তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছিল। যে পরিষদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই পরিষৎ ব্যাধিমুক্ত নয়, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, পরিষদের জন্য অস্ত্র-চিকিৎসা বা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে তিনি কখনও সম্মত হইতেন না। কেহ কেহ ইহাকে দুর্ব্বলতা মনে করিতেন। কিন্তু আজ আর তাঁহার কার্য্যকলাপ ফলের দিক্ দিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; তাঁহার কার্য্যকলাপের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যে নিষ্ঠার এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সযত্নে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল-মৃত্যুতে আমার মনে যে একটা ক্ষোভ থাকিয়া গেল, তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিগত দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের রীতি শিখিবার জন্য দূরদেশে যাইতে-ছিলাম, তখন আমি বলিয়াছিলাম, "বাঙ্গলা দেশের ভূগর্ভে যে সম্পদ্‌প্রত্ন

লুক্কায়িত আছে, তাহার উদ্ধারের, সংরক্ষণের এবং ব্যাখ্যানের রীতি শিখিবার জন্য যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া যেন বসিয়া না থাকিতে হয়, সেই জন্য আপনার সাহায্য চাই।” তিনি উত্তরে বলিলেন,—“ফিরিয়া আসুন, আমার যাহা সাধ্য, তাহা আমি অবশ্য করিব।” আমার এখনও ফিরিয়া আসা হয় নাই; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর মরজগৎ ছাড়িয়া অমর জগতে চলিয়া গেলেন। আশা করি, সেখান হইতে তিনি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের পুষ্টিবর্দ্ধন করিবেন।

---

(১৬)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

আমি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষা দিয়াছিলাম। সে সময়ে আজকালকার মত আই এ ও আই এস্ সি পরীক্ষা ছিল না। তখন বি এ শ্রেণীতে পাঠ করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত' হইতে হইলে যে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে হইত, তাহাকে এফ্ এ বা সাধারণ কথাতে এল্ এ পরীক্ষা বলা হইত। এই পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের পরীক্ষা একই দিনে হইত। প্রথম বিষয়টির পরীক্ষা হইত বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়টির হইত বেলা ২ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে পরীক্ষকগণ পরীক্ষার বেলাতে সাধারণতঃ সিনেট্ গৃহে উপস্থিত থাকিতেন। যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সেই বৎসর অনেক পরীক্ষকই এই গৃহে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রসায়ন-পরীক্ষার বেলাতে সেই গৃহে একজন পরীক্ষকের সহাস্য বদন ও গমন-ভঙ্গি আমার মনে যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছিল, আজ ২৩ বৎসর পরেও সে ছবি জ্বলন্ত ভাবে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। এই আমার আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম দর্শন-লাভ।

এই ঘটনার ৭।৮ বৎসর পরে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত এবং পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছি। তিনি কোনও কার্য্যের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আমি যে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন সভ্যের পদপ্রার্থী হইয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম ও তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে পরিষদের কার্য্যে উৎসাহিত করিলেন। আমি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলাম

এবং সাহিত্য-পরিষদের ধুরন্ধরদের সহিত পরিচয় ও আলাপের সুযোগ লাভ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলাম। অতঃপর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক দিন সন্ধ্যার পরে আমি নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই পত্রে দেখিলাম যে, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইচ্ছুক। তিনি তখন ৬ নং উইলিয়াম্স লেনে থাকিতেন। আমি পরদিন প্রাতঃকালে রামেন্দ্র বাবুর আহ্বানে তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণে সম্মত হইলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি ৮ নং মধুসূদন গুপ্তের লেনে বাসা পরিবর্ত্তিত করিলেন। সে সময়ে আমি সেই বাড়ীর অতি নিকটে এক বাড়ীতে অবস্থান করিতাম। এই সময় হইতে আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলাম ও ক্রমশঃ এই পরিচয় আত্মীয়তাতে পরিণত হইয়াছিল।

মানুষকে জীবনে দুই শ্রেণীর লোকের সহিত কাজকর্ম্ম করিতে হয়;—এক শ্রেণীর লোক তাঁহার ঘরের বাহিরে থাকে ও অপর শ্রেণীর লোক তাঁহার ঘরের ভিতরে থাকে এবং অনেক সময়ে তাঁহার পারিবারিক ও সাধারণ জীবনে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত মিশিয়া প্রধানতঃ তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহার কার্য্যে সমস্ত সময়েই এক আনন্দপরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও উৎসাহ প্রকাশিত হইত। তাঁহাকে স্বীয় তনয়ার ছোট ছেলের নিকট ভূগোলের সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি ও রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-লিখিত 'স্বয়ং-বহ' প্রবন্ধের ব্যাখ্যাও তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি এবং এই দুই সময়েই তাঁহার মুখে তুল্যরূপ উৎসাহ ও আনন্দের ছায়া প্রতিভাসিত দেখিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের নিকট তিনি যে মন্তব্য

প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের দেশে পূর্ব্বপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী যে তিনি কি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহার গৃহে ভোজনাদি সামান্য সামান্য ব্যাপারেও দেখিয়াছি যে, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেশের প্রাচীন প্রথাগুলির প্রতি এক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ভাব জাগিয়া আছে। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতরে ও বাহিরে কোনই প্রভেদ ছিল না এবং তিনি যখনই যাহা করিতেন বা বলিতেন, তাহা তাঁহার প্রাণের কার্য্য ও প্রাণের কথা ছিল। তাঁহার সহিত মিশিয়া তাঁহার চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। আশা করি যে, অপর যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণ ভাবে আমার এই কথার সমর্থন করিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, দেশকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধন আবশ্যকীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন-কার্য্যে অনেকেই নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এই কার্য্যে দুই জনের অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী না থাকিলে সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে ভাবে গঠিত হইতে পারিত কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-গঠন ও উহার সেবাতে ত্রিবেদী মহাশয় যে ভাবে নিজকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। পূর্ব্ববর্ণিত অনুভূতিই তাঁহার এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মূল কারণ। রামেন্দ্রসুন্দর ইহাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে কেবল কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; কিন্তু দেশের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এক জীবন্ত অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং এই হেতু তিনি সাহিত্য-সম্মিলনের গঠন-কার্য্যে বড় কারিকরের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহার ঐকান্তিকতার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা ও দেশের সাহিত্যের অনুশীলন তিনি এতই প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে কখনই নিতান্ত বাধ্য না হইলে ইংরাজী ভাষাতে কিছু লিখিতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করেন। সেই নিমন্ত্রণের উত্তরে তিনি বলেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রবন্ধগুলি মাতৃভাষাতে পাঠ করিতে অনুমতি দেন, তবে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশের সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও সিনেট্ গৃহে তিনি যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। কলিকাতা সিনেট-গৃহে ইংরেজী-নবীশ অধ্যাপকের মাতৃভাষাতে প্রবন্ধ পাঠ বোধ হয় এই প্রথম। তাঁহার যেরূপ মনীষা ছিল ও নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহাতে যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে ইংরাজী ভাষাতে নিজের বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত করিয়া বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার লেখা যে য়ুরোপীয় সমাজে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র তাঁহার 'সত্য' (Diewahrheit) নামক প্রবন্ধের জর্ম্মন্ ভাষাতে লিখিত এক অনুবাদ Archiv fiir systematische Philosophie নামক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদ যে সমাজে প্রকাশিত হইতে পারে, তাঁহার নিজ লিখিত প্রবন্ধগুলি যে সেই সমাজে সমধিক আদর পাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কথা ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার, এই সত্য তিনি এরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, কোনও প্রলোভন তাঁহাকে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে নির্ম্মিত মন্দিরে প্রবেশের দিন সেই মন্দিরে বসিয়া কবি তারস্বরে গাহিয়াছিলেন,—

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমলচরণে স্থান॥"

এবং রামেন্দ্রসুন্দরও চিরকাল এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভাষা-জননীর সেবা করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ছিল এবং শিক্ষকতা ও শিক্ষা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই সমস্ত বিষয় সত্ত্বেও আজকাল বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ নানাপ্রকার দ্রাবক ও যন্ত্রাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক নূতন তথ্যাদি আবিষ্কার, তিনি কিছুই করেন নাই। আমাদের দেশের কোনও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার মতে ত্রিবেদী মহাশয় যদি স্বীয় শক্তি ও সময় 'বেদ' ও 'ব্রাহ্মণে'র আলোচনাতে নিয়োজিত না করিয়া, বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যয় করিতেন, তবে তিনি পদার্থ-বিদ্যা-বিজ্ঞানে অনেক নূতন কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর যদি পদার্থ-বিদ্যার অনুশীলনে ও গবেষণাতে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে যে তিনি পদার্থবিদ্যা-বিভাগে অনেক নূতন কথা বলিতে পারিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তদানীন্তন শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে সময়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ছাত্রদিগকে নিজ হাতে কিছুই করিতে হইত না। বিজ্ঞান-অধ্যয়ন পুস্তক-পাঠেই নিবদ্ধ থাকিত; কেবল মাত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার সময়ে সমস্ত ছাত্রকে কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখাইতেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, সে সময়ে যে সমস্ত কৃতী ছাত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উচ্চ ছাপ পাইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নিজ হাতে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। কারণ, সে সময়ে তাঁহাদের শিক্ষা এই কার্য্যোপযোগী ছিল না এবং এইরূপ গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য পরীক্ষাগারের অভাব বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা বেশী ছিল। তখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ছাত্রদিগকে তাপমান-যন্ত্রের বিভাগ বুঝাইয়া দিতে হইত। এই সমস্ত কারণে তিনি পরীক্ষাগারে বসিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যাপৃত হইতে পারেন নাই; সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। দোষ দিতে হয়, সেই সময়ে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর। পরীক্ষাগারে যন্ত্রাদি সহযোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে ব্যাপৃত না থাকিলেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত তিনি সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তিনি রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদাই বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের সংবাদ রাখিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি এই সমস্ত বিভাগের মূল তত্ত্বগুলির বিবরণের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়, যথা—সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসে তাঁহার ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট ছিল এবং তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধাদিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার "যজ্ঞকথা" নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, "বৈদিকযজ্ঞ সমূহের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যে এমন সরল ভাষাতে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না।" যাঁহারা তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই উক্তির সমর্থন করিবেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এক বহুমূল্য গ্রন্থ। তাঁহার 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার জ্ঞানের পরিধি কত দূর বিস্তৃত ছিল।

যন্ত্রাদির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ত্রিবেদী মহাশয় কখনও করেন নাই; সুতরাং এইরূপ গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া সাহিত্যের সম্পদ্ তিনি বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি যে, বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সহজবোধ্য ভাবে লেখা যাইতে পারে, ইহা তিনি যেরূপ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, সেরূপ আমাদের দেশে আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমি অবগত নহি। আশা আছে যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে এবং সেই সময়ে যে সমস্ত পুস্তক প্রণীত হইবে, ত্রিবেদী মহাশয় 'প্রকৃতি', 'মায়াপুরী' প্রভৃতি লিখিয়া সেই সমস্ত পুস্তকের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধাদিতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংপ্রতি তাঁহার লিখিত ও ভারতবর্ষে মুদ্রিত কয়েকটি প্রবন্ধ 'বিচিত্র জগৎ' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক-পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালের অকাল তাড়নাতে আমরা তাঁহার মতের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত হইতে পারিলাম না। এই পুস্তকে প্রকাশিত শেষ প্রবন্ধের সর্ব্বশেষে তিনি বলিতেছেন, 'রহো—তিষ্ঠ। আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমাকে অভয় দেন, আমি আবার অন্য কথা লইয়া আপনাদের সম্মুখে আসিব।' কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আর তাঁহার আসা হইল না। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি সাধারণতঃ এই সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, সমস্ত শাস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্য হইতে প্রত্যেকটির মূল তত্ত্ব নিষ্কাশন করিয়া ও সেই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনার চেষ্টা। Jevons

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity' হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, 'Knowledge of the lowest kind is *un-unified* knowledge ; Science is *partially-unified* knowledge ; Philosophy is *completely unified* knowledge'. রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আলোচনাতে আমরা এই উক্তিগুলির যাথার্থ্য দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ও দার্শনিক ভাবে উহা সমাপ্ত করিলেন। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্বানুসন্ধী, তিনি এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। আমাদের দেশে আধুনিক সময়ে এইরূপ চেষ্টা কেহ করেন নাই এবং এই স্থানেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার বিশেষত্ব।

পূর্ব্বে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার-প্রদত্ত নিকৃষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছি। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের লেখার সহিত আমি অতি অল্পই পরিচিত। কিন্তু আমি যখনই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, তখনই ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখার ধরণের কথা আমার মনে হইয়াছে। শিশির বাবু তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত অনুবাদের ভূমিকাতে ত্রিবেদী মহাশয়ের চিন্তার ধারার সহিত Descartesএর চিন্তাপ্রণালীর তুলনা করিয়াছেন। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কাজ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্য আমাদের জাতীয় জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও আরও কত বিস্তার করিতে পারিবে, তাহার সম্যক্ আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। নলিনী বাবু সেই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন ও তিনি সেই জন্য দেশবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আশা করি, অবিলম্বে ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি বিস্তৃত জীবন-চরিত লেখার বন্দোবস্ত হইবে ও এই জীবন-চরিতে আমরা তাঁহার নানা দিক্প্রবাহিণী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইব।

লেখক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

আমাদের দেশে ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজে যখন প্রথম ইংরাজী লেখাপড়ার প্রচলন আরম্ভ হয়, তখন যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যেন সমাজের প্রতি ও জাতির প্রতি একটা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইত। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালার ইংরাজীনবীশ কেবল ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের চেষ্টায় বা আশায় ইংরেজী শিখিতেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যেন এক একটা 'মিশন' থাকিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, আমরা ইউরোপের যে বিদ্যা শিখিতেছি, তাহা আমাদের একার উপভোগ্য নহে। জাতি এবং সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সে বিদ্যা-লাভের আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে। কেবল টাকার জন্য, কেবল ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টি-সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্যযুগের কোন ইংরাজীনবীশই উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, শেষ কর্ম্মী ও বিদ্যার সাধক ছিলেন। সত্যই তিনি একটা 'মিশন' লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন **'নবজীবনে'র** প্রথম সন্দর্ভ লেখার সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত এই 'মিশন' বা এই সাধনা তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারার স্বরূপ ছিল, কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে দেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে এই জীবনব্যাপী সাধনার কথাটা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই 'মিশন' বা সাধনা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে তিন ভাগে বা তিন পর্য্যায় বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম ভাগ ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রচারের ভাগ। ইউরোপের

আধুনিক সায়েন্সে কি সব পদার্থতত্ত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যটি করিতে যাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার গদ্যের ব্যাপ্তি এবং ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে দেখাইয়া যান যে, ইউরোপের সায়েন্সের কথা কেমন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিলে তাহা বহুজন-বোধ্য হইবে। তিনি যখন এই চেষ্টায় ব্রতী হন, তখন বাঙ্গালায় তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি ও-কার্য্যে রত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-রহস্যে গোটা-কয়েক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রামেন্দ্রের মত সায়েন্সে তত পণ্ডিত ছিলেন না এবং সায়েন্সের কথা সরল বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিবার শব্দ-সম্পৎ পর্য্যাপ্ত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না।

২। রামেন্দ্রের মনীষার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শন-শাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে তুলনার সমালোচনায় 'তুলিত' করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ যাচাই-চেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব্ব; তিনি ইহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় অতুল্য ভাবে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই তুলনার সমালোচনা করিতে যাইয়া রামেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের পুঁজি তাঁহার বড় কম। তিনি অমনি বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-শাস্ত্রেরও আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং শেষে তন্ত্রের পরিচয়ও বেশ লইয়াছিলেন। বাঙ্গালার কোন এক মনীষী লেখক একবার বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবু সায়েন্সেই খুব বড় পণ্ডিত, শাস্ত্রকথা তিনি কতটুকু জানেন? এইটুকু রামেন্দ্রের কানে যায়। তার পর সাত বৎসর কাল রামেন্দ্র যেরূপ অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত বেদ-বেদান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। দিনের বেলায় রিপণ কলেজের

প্রিন্সিপ্যালের কাজ, সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের কাজ সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া, রামেন্দ্র বিনিদ্র রজনী আগাগোড়াই বেদ ও তন্ত্রের আলোচনায় কাটাইয়া দিতেন। এই উৎকট পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার যকৃৎরোগ হয় এবং সেই রোগেই অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়। রামেন্দ্র পরের মুখে কখনই ঝাল খাইতেন না, প্রত্যেক বিষয়টিই নিজে দেখিয়া, নিজে যাচাই করিয়া লইতেন। তাই তাঁহাকে অতিমাত্রায় পরিশ্রমও করিতে হইত। এই পরিশ্রমের ফলে রামেন্দ্র যে কয়খানি পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব এবং তাহার তুল্য আর কোন পুস্তক যে শীঘ্র লিখিত হইবে, এমন আশা আমাদের নাই।

৩। তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিদ্যার মাপ-কাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে ছোট ত হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপ-কাঠির বাহিরে ; ইউরোপ এখনও সে ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বেদ সম্বন্ধে তাঁহার যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল, তাহা এই ভাবেই ভরপূর এবং তেমন বৈদিক বিদ্যার পরিচয় দিয়া বৈদিক সন্দর্ভ ভারতবর্ষের আর কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সঙ্গে 'শব্দকথা', 'কর্ম্ম-কথা' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'শব্দ-কথা'র ন্যায় পুস্তক ত বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত তিনি অতি সোজা কথায় লিখিয়া গিয়াছেন। যে দিন এই সকলের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িবে, সেই দিন বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ এই সকল পুঁথি মাথায় করিয়া রামেন্দ্রের স্মৃতির পূজা করিবে। রামেন্দ্র জীবিত থাকিলে তন্ত্রোক্ত শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া যাইতেন। বিধাতা

বাদী না হইলে পুরাণের বিশ্লেষণও তিনি করিয়া যাইতেন। আমাদের ভাগ্য-দোষে আমরা সে সকলে বঞ্চিত আছি। জানি না বিধাতার কৃপায় ভবিষ্যতে রামেন্দ্রের এই অপূর্ণ কার্য্য বাঙ্গালার কোন মনীষী পূরণ করিতে পারিবেন কি না।

ইহাই রামেন্দ্রের বিদ্যা-আরাধনার খুব স্থূল পরিচয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। আজকাল লেখা-পড়া শিখিয়া ইউনিভারসিটির উচ্চ উপাধিধারী হইয়া বাঙ্গালী যুবক টাকার জন্য পাগল হইয়াছে। এবং অর্থোপার্জ্জনের চিন্তায় বিদ্যাকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়াছে, তাই শঙ্কা হয়, রামেন্দ্রের জীবনের কর্ম্মসূত্র রামেন্দ্রের শ্মশান-চুল্লীতেই বুঝি বা দগ্ধ হইয়া গেল ; সে ধারা রক্ষা করিবার মানুষ ত আর দেখি না। রামেন্দ্র টাকা চাহেন নাই, পদ-মর্য্যাদা চাহেন নাই, উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জীবনে কখনও প্রকাশ করেন নাই ;—অথচ এ সকলই তিনি ইচ্ছা করিলে পাইতে পারিতেন। রামেন্দ্র দেবী ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাঁহার আরাধনায় জীবন, যৌবন, ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা—সবই বলিদান দিয়াছিলেন এবং নীরবে নিজের সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সে সিদ্ধি কর-আমলকবৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। সে সিদ্ধির ঐশ্বর্য্যে স্বদেশবাসীকে পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্যশালী করিবার অবসর তাঁহার জীবনে ঘটিল না। ইহা আমাদের পক্ষে বড় শোকের, বড় ক্ষোভের কথা।

সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি, তাহার পুষ্টি ও বিস্তৃতির চেষ্টা রামেন্দ্র-জীবনের এই সাধনার অঙ্গীভূত ছিল। এই সাধনার সিদ্ধিগত ঐশ্বর্য্য-লাভের যোগ্যতা যাহাতে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য রামেন্দ্র সাহিত্য-পরিষদের সেবায় জীবনপাত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মজ্জাগত জাতিপ্রীতি—ন্যাসন্যালইজ্‌ম্‌-এর অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "জাতিটাকে বড় করিতে হইলে গোড়ায় জাতীয় ভাষাটাকে ব্যাপক ও সর্ব্বভাব-

দ্যোতক করিয়া তুলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষাকে রাজভাষার অধিক আদরের, অধিকতর শ্লাঘার সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচলিত শ্রদ্ধা-বুদ্ধি না থাকিলে যে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, ইহা রামেন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের সেবায় রামেন্দ্র সত্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রের বিদ্যা-সাধনার বীরাসন ছিল, সেই বীরাসনে বসিয়া বীর কর্ম্মী বাঙ্গালীকে বীরের ভাষা দান করিয়া গিয়াছেন—বীরের সঞ্জীবন-মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি না, বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ বীরের গাঁথা ঠিক-মত বুঝিয়াছে কি না;—বুঝিলে আজ সাহিত্য পরিষদের রামেন্দ্রের কর্ম্মসূত্র ধরিয়া বহু বিদ্যাসাধক নির্ম্মৎসর ভাবে দেবী ভারতীর আরাধনা করিতেন। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, কর্ম্মীর কর্ম্ম ব্যর্থ যায় না, সাধকের সাধনা কর্পূরের মত আকাশে উবিয়া যায় না,—এই নশ্বর জগতে কর্ম্ম ও সাধনাই অবিনশ্বর; কাল পূর্ণ হইলে, মায়ের কৃপা ফুটিয়া উঠিলে রামেন্দ্রের সে সাধনার পরম পারম্পর্য্য, সে কর্ম্মের ধারা আবার প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই ভাবের মুখে বলিয়াছিলাম, "রাম আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যামন্দিরের শেষ রাম, এ রামের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার সময় আসে নাই, তাই আমরা তেমন আর একটি রাম বাঙ্গালার কোন ভাব-কুঞ্জে খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে দিন তেমন আর একটি রাম অবতীর্ণ হইবেন, সেই দিনই রাম-লিখিত কথা-পুস্তকগুলির প্রকৃত পঠন-পাঠন আরব্ধ হইবে, রামবার্ত্তা বুঝিবার সামর্থ্য বাঙ্গালায় আবার ফুটিয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের কর্ম্মীর পদাঙ্ক বালুকা-বিস্তারের উপর অঙ্কিত হয় না, উহা দুদিনেই বিলীন হইয়া যায় না; ভারতবর্ষের কর্ম্মী ও সাধকের পদাঙ্ক অপরিবর্ত্তনীয়, মর্ম্মরাসনে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা মুছিয়া যায় না, কেহ বুঝিতেও পায় না। তাই ভারতবর্ষের অনন্ত অতীতে কর্ম্মিপ্রধানগণের পদাঙ্ক ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গে খচিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে

রামেন্দ্রের পদাঙ্কও অনপনেয় লেখায় ভারত-নগেন্দ্রের গাত্রে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। পুরাণের এই সিদ্ধান্তে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই আজ এই ঘোর নিশায় ভারত-মহাশ্মশানে মনীষার দিব্যদ্যুতি আবার দেখিবার আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। এ জীবনে সে আশা পূর্ণ না হইলেও নিরাশ হইব না, আবার ফিরিয়া আসিয়া সে আশা-পথ চাহিয়া থাকিব।”

—o—

(১৮)

লেখক—অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
এম্ এ পি এচ্ ডি

স্কুলের ছাত্র যখন ছিলাম, তখন কিছুই বুঝি নাই, তোমার রচনার স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে আন্দোলিত হইয়া শুধু আবৃত্তি করিতাম আর মুগ্ধ হইতাম। কলেজে যখন পড়ি, তখন তোমার ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় আমার তরুণ হৃদয় কল্পনার কত না সোণালী জাল রচনা করিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ আসিত, এই জরাগ্রস্ত অপটু দেহ-পঞ্জরে এত খানি আশা ও আকাঙ্ক্ষা কিরূপে সম্ভবে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। জাতীয় শিক্ষা, সমাজ-সেবার পথ-নির্ণয়ের যুগ। স্বদেশাত্মার স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সেই তখন প্রথম উদ্যম। তখন দেখি বাঙালীর যৌবনের সকল আবেগ আশা-পুলকিত, কম্পিত হৃদয়ে তুমি বাংলার সাহিত্যকে নূতন পথে আহ্বান করিতেছ। ভাষা ও ইতিহাস, ধর্ম্ম ও লোকাচার, জনপ্রবাদ ও লোকসাহিত্যের তথ্য-অনুসন্ধানের পিপাসা-মন্ত্র জাগাইয়া তুমি অকালে কোথায় চলিয়া গেলে? তোমার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের আশীর্ব্বচন যে গৌড়ের বিজন অরণ্য, বরেন্দ্রভূমির ভগ্ন প্রাসাদ, বীরভূমির নদীসৈকত-বিহারী কত ভীত পথিকের ত্রাস হরণ করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তুমি প্রতীক্ষা কর নাই। তোমার চির উজ্জ্বল ধীর প্রতিভা, নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত নিরন্তর সাহিত্য-পরিষদের গতি নির্ণয় করিয়া দিতেছিল; শত লোকের স্বার্থ যে গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকার বিস্তার করিয়া এখন গন্তব্যের পথে মুখ ব্যাদান করিয়াছে, কোন্ নিদারুণ ভাগ্যবিধাতা সে স্নিগ্ধ চিরমাধুর্য্য-মণ্ডিত জ্যোতিঃ অকালে নির্ব্বাপিত করিল। হে অল্পায়ু, তুমি অকাল-বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত বাঙালীর অকাল মৃত্যু পর্য্যন্তও কি বরণ করিলে!

হে চির নবীন, তুমি বলিতেছ, ততঃ কিম্। তুমি স্নেহের দ্বারা ক্রোধকে, শ্রদ্ধার দ্বারা অবজ্ঞাকে, স্বদেশপ্রীতির দ্বারা স্বার্থকে, আনন্দের দ্বারা ব্যাধিকে, কীর্ত্তির দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে বলিয়াছ।

হে শালপ্রাংশু মহাভুজ, তোমার উত্তোলিত হস্ত কি আবার পুরুষকারকে আহ্বান করিবে না? তোমার বৃষস্কন্ধ কি আবার গুরুভার বহন করিতে আদেশ করিবে না? শিশুর সরল হাস্যে নির্দ্দয়তাকে বশীভূত করিতে আবার শিক্ষা দিবে না?

হে নিষ্কাম কর্ম্মি, তুমি স্বধর্ম্মাচরণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছ। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচারের কথা কহিয়া তুমি কর্ম্মমার্গের পথিককে পথ দেখাইয়াছ। লৌকিক আচার ও অনুষ্ঠান, কাহিনী ও আখ্যায়িকা, নানা প্রকার যাগ-যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়া, তুমি সমাজ-ধর্ম্মের আদর্শ পরিস্ফুট করিয়াছ।

হে আচার্য্য, তপোবনের শিক্ষার আনন্দ, ব্রহ্মচর্য্যের গরিমা, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ফিরাইয়া আনিবার তোমার যে মহনীয় কল্পনা ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ভারত-প্রতিভা-সম্মিলনের যে ব্যাকুল আশা ছিল, সে কল্পনা ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহাদের সুবিচার করিবে। প্রাচ্য বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্য ও উপপাদ্য ব্যাখ্যা করিয়া তুমি যে চিন্তার আন্দোলন তুলিয়াছিলে, সুদূর জার্ম্মাণীতেও তাহার সাড়া পড়িয়াছে।

হে নব্য বৈজ্ঞানিক, তোমার লেবোরটারী ছিল—আদ্যা-প্রকৃতির বিশাল লীলা-ক্ষেত্র। তুমি শুধু প্রকৃতি-রাণীর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের শ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হও নাই। তুমি সেখানে রুদ্রমূর্ত্তি হরকে আট প্রহর শিঙ্গা বাজাইয়া প্রলয়ের মুখে টানিতে দেখিয়াছ, আর বরাভয়করা গৌরীকে সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতে দেখিয়াছ। তাই তোমার মস্তক নীরবে মহাকাল ও মহাকালীর অসাধারণ ও অতি-প্রাকৃত ঘটনালীলায় চির-অবনত। হে নির্ভীক জিজ্ঞাসু, বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধী পাশ্চাত্য বিদ্যার সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলির অসারবত্তা

তুমি প্রমাণ করিয়াছ। তুমি বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিচার করিয়াছ। দেবরাজের বজ্রে একদিন যাঁহার আবির্ভাব ছিল, তাঁহাকে দিয়া পাখা টানাইয়া যে বিজ্ঞান আত্মপুষ্টিতে যত্নবান্, তাহার গর্ব্বকে তুমি খর্ব্ব করিয়াছ। লঙ্কেশ্বরের অহঙ্কারের ফল তুমি পুনরায় ঘোষণা করিয়া, বুদ্ধি-বৃত্তির বাহ্য জগতের উপর দম্ভের সহিত প্রভুত্ব খাটানকে তুচ্ছ করিয়াছ। প্রত্যক্ষ-গোচর ও অনুমানলব্ধ বৈজ্ঞানিকগণের কল্পিত জগৎকে সংকীর্ণ পারিভাষিক জানিয়া তুরীয় আনন্দের অনুসন্ধানে তুমি বিজ্ঞানপুরীর কত প্রকোষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছ এবং বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাতায়াতের পথও ইঙ্গিত করিয়াছ। পাঁচটিমাত্র সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ব্যাবহারিক শাস্ত্র সমুদয়ের দেশ, কাল, আকাশ, জড় ও শক্তি বিষয়ক কতগুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধির স্তম্ভের উপর যে বৃহদায়তন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহার অন্তঃপুরে বিজ্ঞান-সুন্দরী রূপার কাটির স্পর্শে গভীর মায়ায় আচ্ছন্ন। বিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-কর্ম্ম মায়াময়ীকে জাগাইবার ও ঘুম পাড়াইবার রূপার কাটি, সোনার কাটি। মায়াময়ীর অভিনয়ের ঠিক-ঠিকানা নাই। সে কখনও সোহাগিনী, জীবনযাত্রার সহচরী, কখনও বা তাহার বিপরীত ভাব। করালিনী হইয়া অসংখ্য নরমুণ্ডের মালা পরিয়া সে তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা মানবকে ত্রস্ত হতবুদ্ধি করিয়া তুলে; তখন তাহার অতি-প্রাকৃত নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে জীব, মানব, ও সভ্যতার জন্ম-মরণ, অভ্যুত্থান-পতনের কত না বিচিত্র ইতিহাস শোণিত-লেখায় অঙ্কিত হয়।

ভয় নাই—ভয় নাই! তুমি অভয় দিয়াছ। হে ঋষি, তুমি অমোঘ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছ, বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য

কিছুই নাই, পরা-বিজ্ঞানই আনন্দ ও পরা-বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। হে নির্ভীক সাধক, তুমি তপ ও সত্যলোকের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছ, সেখানে বিজ্ঞানের প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি চলে না। পরা-বিজ্ঞান কল্যাণ ও অমৃতের প্রবাহে জীবনকে অভিষিক্ত করিবে, তুমি আশ্বাস দিয়াছ।

হে ভগীরথ, তুমি বাঙ্গালা দেশে সেই অমৃত-প্রবাহ আবার আনিয়াছ, আমরা অঞ্জলি ভরিয়া সেই সুধা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। আমার বাঙ্গালার এই চির-কলতান উদার-গঙ্গায় স্নানারাম ভোগ করিয়া বিশ্বমানব তৃপ্ত হইবে। শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, বিজ্ঞানের গর্ব্ব, মানবের ভোগজীবনের সমর-ক্ষেত্রে কোটি মানবের দুঃখ, বেদনা ও নিস্ফলতা জাগাইয়া রাখিতেছে। বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর আরাম-নিকেতন ত্যাগ করিয়া, জাতির সাম্রাজ্য-ক্ষুধা ও বিজ্ঞানের ভোগ-স্পৃহা দমন করিয়া, বিশ্ব-মানব যখন পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনী-তটে বাঙ্গালার অতিপ্রাকৃত প্রেম ও ভক্তিতে অভিষিক্ত হইবে, তখনই তোমার বিজ্ঞান চর্চ্চা, আমার জাতীয় ভাব-সাধনা—আমার বাণীর সুললিত ঝঙ্কার সার্থক হইবে।

---

(১৯)

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

(ক)

যে সকল দীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে বঙ্গবাণীর মন্দির আলোকিত ছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুতে তাহার একটি দীপ নিবিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর হইতে রামেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মের বিরাম ছিল না। এই অবস্থায় কয় মাস পূর্ব্বে দুঃসহ কন্যাশোকে রামেন্দ্রসুন্দরের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী পরলোকগত হন। রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে স্বগ্রাম জেমো-কান্দীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কয় দিন মাত্র কলিকাতা-বাসের পর জাহ্নবীর কূলে দেহরক্ষা করেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না. যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর পূরণ হইবে না, হইবার নহে।

বিজ্ঞানে, দর্শনে, বেদে রামেন্দ্রসুন্দরের অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি দর্শন বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের কথা সরলভাবে বাঙ্গালায় বুঝাইয়াছেন। প্রকৃতির রহস্য তিনি সরল বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছেন। রামেন্দ্রহীন সাহিত্য-সমাজ রামহীন অযোধ্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা দীর্ঘ কাল, প্রায় ২০ বৎসর, রামেন্দ্র বাবুর বন্ধুত্ব সম্ভোগের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরিষদের সম্পর্কে একযোগে কাজ করিয়াছি, কোন দিন রামেন্দ্র বাবুর উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ পাই নাই, মতান্তরের অবসর ঘটে নাই; কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর কখন অন্যায় মত পোষণ করেন নাই। পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের যে

সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ যাঁহারা দেখেন নাই, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, ১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনাবধি তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে দিন পরাবসথী পরিষদ্‌কে স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরিষদের সহকারী-সম্পাদকরূপে সভা আহ্বান করিয়াছিলাম, সে দিনও রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়াছি। যখন পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, তখনও রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে গিয়াছি। যখনই পরিষদের কোন বিপৎ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনই দূর-চক্রবালে বিপদের মেঘ-সঞ্চার লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিয়াছেন। এই পরিষৎ লইয়া কেহ কেহ রামেন্দ্রসুন্দরের কার্য্যেও কলঙ্কলেপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু সে কলঙ্ক শেষে তাঁহাদিগকেই কলঙ্কিত করিয়াছে—রামেন্দ্রসুন্দরকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের শুভ্র তুষার কি কেহ মলিন করিতে পারে ? পরিষদের জন্য বাঙ্গালার অনেক ধনী, অনেক কোবিদ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের পরিষদ্-প্রেমের তুলনা ছিল না। কাসিমবাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ অবসর দান করিয়াছেন। কিন্তু সে দানে কেহই নিঃস্ব হয়েন নাই। ব্রাহ্মণ রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কাজে আপনার স্বাস্থ্য ও উদ্যম ব্যয় করিয়া শয্যা লইয়াছিলেন, সেই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা। রামেন্দ্রসুন্দরের এই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন একজন—ব্যোমকেশ মুস্তফী।

রামেন্দ্র-হীন পরিষদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, কে বলিতে পারে? দীর্ঘ ২০ বৎসরকালের প্রথম ১৫ বৎসর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সন্ধান লইয়াছি, "রামেন্দ্রবাবু আসিয়াছেন ত?" শেষ পাঁচ বৎসর পরিষদ মন্দিরে পদার্পণ করিয়াই সন্ধান লইয়াছি, "রামেন্দ্রবাবু কেমন আছেন?" আজ সেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের ভাবনা হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ ও আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচরূপে পরিষদকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিষদের সহিত সম্পর্কশূন্য করিবার চেষ্টায় রামেন্দ্রসুন্দর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। যাঁহারা রামেন্দ্রসুন্দর অসুস্থ বলিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য সভামধ্যে "যমদণ্ডে পীড়িত" বলিতেও একটুমাত্র লজ্জানুভব করেন নাই, তাঁহাদের উপরও রামেন্দ্র-সুন্দর রাগ করেন নাই; এমনই তাঁহার ক্ষমাশীলতা। পরিষৎ তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার নিকট আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণস্বীকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড় আশঙ্কা ছিল, বুঝি কাল সে চেষ্টার অবসরও দিবে না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে পরিষদের বার্ষিক সভায় রামেন্দ্রসুন্দর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

রাজনীতিতে রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয় দলভুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও দলাদলির আবর্ত্তে পতিত হয়েন নাই—কখন প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু তিনি মতে ও কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী ছিলেন। সোমবার প্রাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দরকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্র-সুন্দরের উপাধিবর্জ্জনের কথার আলোচনা হয়। সেই দিন অপরাহ্ণেই তাঁহার জ্ঞানলোপ হয়—আর জ্ঞানোদয় হয় নাই।

শনিবার অপরাহ্ণেই বুঝা গেল—দীপ-নির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই। সংবাদ পাইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধুবান্ধবেরা শেষ বার রামেন্দ্র-ভবনে গমন করিলেন। তখন জীবনের আর কোন আশা নাই। সেই দিন রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় রামেন্দ্রসুন্দর আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন।

তিনি পরিষদের রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার বাসনা বুকে লইয়া শ্মশান-শয়নে শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণ যদি তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার উপায় করেন, তবেই তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করা হইবে।

(খ)

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের দুইটি কার্য্যের কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কোবিদ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব সরল ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য করিয়া গিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের স্বরূপ ও দর্শনের কথা বাঙ্গালীকে যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, সে ভাবে আর কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থানে করিব না—রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-কীর্ত্তির সমালোচনা করিবার সময় এ নহে—করিবার যোগ্যতাও আমাদের আছে বলিয়া মনে করি না।

আমরা যে দুইটি কাজের কথা বলি, সে দুইটি রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য করিয়াছিলেন। প্রথম—সাহিত্য-সম্মিলন; দ্বিতীয়—সাহিত্য-পরিষৎ।

সাহিত্য-সম্মিলনের কল্পনা রামেন্দ্রসুন্দরের। সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্য-

লেবকদিগকে সম্মিলিত করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবিধ বিভাগের—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চারি বিষয়ের আলোচনা করিয়া, সাহিত্যের সৃষ্টির ও পুষ্টির উপায় বিধান করায় বাঙ্গালার যে কত উপকার হইতে পারে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সাহিত্য-সম্মিলন এই কয় বৎসরে বিবিধ অভিভাষণাদিতে ও প্রবন্ধে যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে যে আমাদের সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। যে বৎসর যে কেন্দ্রে সম্মিলনের অধিবেশন হয়, সে বৎসর সেই কেন্দ্রে সাহিত্য-সাধনা বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, এবং বিবিধ স্থানের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে পরিচয়ে ও সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনায় যে ভাবের প্রবাহ পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আমাদের রাজনীতিক সমিতির মত এই সাহিত্য-সম্মিলন ও জাতীয় জীবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। যত-দিন বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলার সাহিত্যিকদিগের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালা সাহিত্য সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম না হইবে, ততদিন বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতি হইবে না—হইবার উপায় নাই। ইহা বুঝিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র পত্র-সূচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" ইহা বুঝিয়া তিনি—সে কাজ একজনের সাধ্য নহে বলিয়া—সুশিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকদিগকে লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত আত্মচরিতে ইহার উল্লেখ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন শাসক ও চালক হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগের পুষ্টি সাধিত হয় নাই—বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের প্রভাব-মুক্ত হইয়া ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তগত হইতেছে। তখন 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা যে কাজ সাধিত হওয়া সম্ভব হইত, আজ তাহার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজন। আজ পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ—বাঙ্গালার সকল ভাগেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—বাঙ্গালারপ্রাচীন সাহিত্য জীর্ণ পুথিতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। সে সব সংগ্রহ করিতে হইলে, বাঙ্গালার সকল ভাগেই কাজের প্রয়োজন। কিন্তু সেই সব কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, পদ্ধতিবদ্ধ করিবার জন্য—উপহৃত উপাদান একত্রিত করিয়া, তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনের মত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সম্মিলন অদ্যাপি সে কাজ করিতে পারিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু এই আদর্শের—এই আদর্শে সম্মিলন গঠনের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না—করিতে পারিবেন না। রামেন্দ্রসুন্দর সেই আদর্শের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সে কার্য্যে তিনি যে অনেকের সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা জানি; কিন্তু কল্পনার গৌরব রামেন্দ্রসুন্দরের।

পরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণপাত করিয়াছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ, 'ঠাকুরাণীর কথা'র লেখক ক্ষেত্র বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "পরিষদের কেরাণীগিরি করিয়াই রামেন্দ্র মরিল।" তিনি অবশ্য কথাটা বিদ্রূপ করিয়াই

বলিতেন। কিন্তু শুনিয়াছি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রামেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানাগারে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিত, তিনি পরিষদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করায় দেশ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই কথার একটু আলোচনা প্রয়োজন। পরিষদের দ্বারা দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন বুঝিয়াই রামেন্দ্র-সুন্দর পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে অকাতরে জীবন দিয়া পরিষদকে স্থায়িত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সে সেই আশায়; তিনি যে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও পরিষদের ভাবনা ভাবিয়া গিয়াছেন, সে সেই আশার উত্তেজনায়। রামেন্দ্র বাবু তাঁহার বিজ্ঞানশিক্ষা সার্থক করিবার জন্য বিজ্ঞানাগারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, হয় ত কোন নূতন আবিষ্কারের পথ দেখাইতে পারিতেন, বিজ্ঞানজগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। রামেন্দ্র-সুন্দর যে সে পথে না যাইয়া পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন—বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, আপনি যশের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই রামেন্দ্র-চরিত্রের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়—রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মত্যাগের মহিমা বুঝিতে পারা যায়। তিনি যশের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না—তিনি কাজের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। পরিষদের দ্বারা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে, এ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা রামেন্দ্রসুন্দরের এই কাজের জন্য আক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাহেতু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শের অনুসরণ-চেষ্টা করিবেন।

রামেন্দ্রবাবুর প্রতিভার স্বরূপ যাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবেন। প্রতিভা নানা প্রকারের।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভায় উদ্ভাবনী শক্তি উদ্ভূত হইত কি না, কে বলিতে পারে? তাঁহার প্রতিভায় বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা দার্শনিক প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুট। তিনি যাহা আপনি বুঝিতেন, তাহাই অসাধারণ দক্ষতা সহকারে অপরকে বুঝাইতে পারিতেন। যে সব জটিল বিষয় তিনি যেমন সরল ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, সে সব জটিল বিষয় তেমন করিয়া আর কেহ বাঙ্গালীকে বুঝাইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু যে প্রতিভা ব্যাখ্যার কাজে এমন অসাধারণ ছিল, সে প্রতিভা বিজ্ঞানাগারে টেষ্টটিউব ও অ্যাসিডের মধ্যে কতটা বিকাশ পাইত, বলিতে পারি না। রামেন্দ্রসুন্দর যে আপনার প্রতিভার প্রকৃতি বুঝিয়াই তাহাকে তাহার উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করেন নাই, এমন কথা কে বলিতে পারে? তবে কি রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিয়া ভুল করিয়াছিলেন? তাহা নহে। তিনি বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া কেবল যে বিজ্ঞানের কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন, তাহাই নহে; পরন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার উদ্দাম ভাব দূর হইয়াছিল, তাহা সংযত হইয়াছিল, তাহা কোথায়ও অতি-বিস্তৃতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রতিভা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের জড় দেহ জাহ্নবীর কূলে ভস্মীভূত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বন্ধুত্বের গৌরবে গর্ব্বানুভব করেন, তাঁহাদের দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে। তখন রামেন্দ্র-কথা বলিবার লোক আর নাও থাকিতে পারে। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, আর যতদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থাকিবে, ততদিন রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া বিরাজিত থাকিবে।

(২০)

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, বি এল্‌

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এ জগতে বিদ্যমান ছিলেন—তিনি নিকটে ছিলেন—রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তির উচ্চ আসনে আরূঢ় হইয়া আমাদিগের মাঝে বিরাজ করিতেছিলেন। নিকটে থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু আজ তিনি অপার্থিব লোকে অন্তর্হিত বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব আরও নিবিড় ভাবে উপলব্ধ হইতেছে। চলিত কথায় বলে, যেমনটি যায়, তেমনটি আর আসে না। আসার কথা দূরে থাকুক—তাহার মতটিও যে রয় না—ইহা আরও ক্ষোভের বিষয়। বাহ্য জগতে ক্রমিক আরোহ-অবরোহ দেখি—মনুষ্য-সমাজে কেন দেখি না? এখানে মহৎ লোকের পার্শ্বে ও চতুর্দ্দিকে শুধু রাশি রাশি মাঝারি মানুষ। সেই জন্যই রামেন্দ্র বাবুর মত মহাপুরুষের তিরোধানে এতটা অভাব বোধ হয়—"মনোরথানাং অতটপ্রপাতঃ" অনুভূত হয়।

রামেন্দ্রবাবুকে যাঁহারা নিপুণভাবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা সে মহাপুরুষের বিস্তৃত ও যথাযথ পরিচয় দিতে সমর্থ। যাঁহারা —আমার মত—অল্পদিন মাত্র তাঁহার সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার অসাধারণতা অনুভব করিয়াছেন। মনুষ্য-প্রকৃতির রহস্য এই যে, সকল অবস্থাতেই তাহা আপনাকে ব্যক্ত করে। বৃত্তের যে কোন অংশের স্বরূপ জানিলেই—মাত্র তিনটি বিন্দুর অবস্থান জানিলেই—সমগ্র বৃত্তের আকৃতি অবগত হওয়া যায়। শুনি, রেখারচিত সকল আকারের মধ্যে বৃত্তই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুষমান্বিত। মনুজাকৃতির

মধ্যেও যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও সুষমান্বিত—যাঁহারা লোকোত্তর বৃত্ত—তাঁহাদের সম্বন্ধেও অনেক স্থলে "একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে—তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল —Sweetness and light। সর্ব্ববিধ বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম, এবং লৌকিক ব্যবহারে মাধুর্য্যের লীলা—এই দুইটি তাঁহার অন্তরকে গম্ভীর, চরিত্রকে মনোরম, ললাটকে প্রশান্ত ও মুখকে হাস্যময় করিয়াছিল। তিনি স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের মূর্ত্তি ছিলেন—মিতভাষী অথচ মিষ্ট-ভাষী ছিলেন। সহসা কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় পরস্পরের স্বার্থের দ্বন্দ্বে অনেক সময়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—তাহার ধূলিতে চিত্ত কলুষিত হয়, সংঘর্ষে অন্তর উত্তপ্ত হয়। এই ধূলি ও উত্তাপের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর আপন প্রশান্ততা, চিত্তের স্বচ্ছতা ও শৈত্য হারাইতেন না। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন কি না, জানি না—কিন্তু নির্বিরোধ ছিলেন যে, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি কায়মনোবাক্যে বাগ্‌দেবীর সাধনা করিতেন—সেই সাধনাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই তাঁহাতে একাধারে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষায় পারদর্শিতার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে এমন বিচক্ষণ অভিনিবেশ—বাঙ্গলা দেশে ক্বচিৎ ঘটিয়াছে।

নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ না হইলে তিনি সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইতেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান হইয়াও তিনি বহুল পরিমাণে উহা হইতে অসম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁহার লোক-হিতৈষণা পরিষদের চিন্তায় ও তাহার উন্নতি সাধনাতেই যেন সমগ্রভাবে ব্যয়িত হইত। ইহার দুইটি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। গতপূর্ব্ব বর্ষে কলিকাতা সহরে নিখিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এক সাধারণ অধিবেশন হয়।

তখন শ্রীমতী বেসান্ট মহোদয়ার সভানেত্রী হওয়ার সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেকে প্রথমে বিরোধ করেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিশেষে কংগ্রেস সভায় তাঁহার নির্ব্বাচন প্রস্তাবের সমর্থন করিলেও প্রথমে এই প্রতিবাদী পক্ষে ছিলেন। যেদিন ভারত-সভা-গৃহে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির একটি অধিবেশন হয়, সেদিন কলেজে আসিয়া শুনিলাম, রামেন্দ্রবাবু শ্রীমতী বেসান্ট মহোদয়ার পক্ষে ভোট দিবার জন্য, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া সভায় গিয়াছেন। রাজনৈতিক সমস্যা যখন জটিল হইয়া উঠিত, লোকমতকে যখন জয়যুক্ত করিবার প্রয়োজন হইত, রামেন্দ্রবাবু তখন বিনা দ্বিধায় তাঁহার দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতেন। বক্তৃতা করিবার উপযোগী দৈহিক বল শেষ বয়সে তাঁহার আদৌ ছিল না। কিন্তু যখন যাহা লিখিতেন, তাহা খাঁটি সোনা হইত। বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তাঁহার যে কয়টি প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়, সেগুলিও এই খাঁটি সোনা। এই খাঁটী সোনা আদায় করিবার জন্য, তাঁহার পরিণত পাণ্ডিত্যের ফল আস্বাদন করিবার জন্য শিক্ষিত সমাজ তৎকালে আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবন্ধগুলি পঠিত হওয়ার সময় যেরূপ সকল সম্প্রদায়ের বিদ্বান্ ও জিজ্ঞাসুর সমাগম হইত—তাহা যথার্থই এক অপূর্ব্ব ও বিরল দৃশ্য।

রামেন্দ্রসুন্দর মানের কাঙাল ছিলেন না—না রাজদরবারে, না জনগোষ্ঠীতে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।" সম্মানকে দূরে পরিহার করিবার এই যে স্পৃহা—ব্রাহ্মণ্যের এই যে সনাতন লক্ষণ, ইহা তাঁহার চরিত্রে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান—এই যোগাড়ের যুগে—ঐহিক সর্ব্বস্বতার এই মাহেন্দ্রক্ষণে সম্মান-বিরাগ এ দেশে ক্রমশঃ অলীক কল্পনায় দাঁড়াইতেছে।

যাচিয়া এখন মান লইতে লোকে লালায়িত। দান করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রচার করিয়া, উমেদারী দ্বারা খেতাব অর্জন করিয়া, জীবদ্দশায় স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া—ঔর্দ্ধদৈহিক তর্পণ-কৃত্যও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আপন আপন চক্ষুর সম্মুখেই সারিয়া লইতেছেন। পাছে অধস্তন পুরুষেরা অবহেলা করে, বিস্মৃত হয়, পাছে নিজের প্রাপ্য যশোরাশির কোন ভগ্নাংশ হইতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হইতে হয়। পুরাকালে এ দেশে লোকে দান-দুর্গোৎসব অতিথি-সৎকার, পূর্ত্তকার্য্য করিত—তাহাদের আস্থা ছিল যে, পরবর্ত্তী পুরুষেরা কৃতজ্ঞভাবে তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিবে। রামেন্দ্রসুন্দর এ দেশের প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিতেন—অশনে ও বসনে—চিন্তায় ও ব্যবহারে। তিনি দেশবাসীকে চিনিতেন এবং নিজে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাই সম্মান-প্রাপ্তির জন্য জীবিতাবস্থায় তিনি উৎকণ্ঠিত হন নাই—শেষ পর্য্যন্ত উপাধি ও কর্ত্তৃত্বে লাঞ্ছিত না হইয়া তিনি শুধু শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দরই ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন—কিন্তু তাই বলিয়া তমসাচ্ছন্ন লোকে তাঁহার আত্মা বা তাঁহার নাম বিচরণ করিবে না। তাঁহার অপূর্ব্ব সন্দর্ভগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে—তাঁহার বিনয়ের কথা, তাঁহার সৌজন্যের কথা,—রামেন্দ্রসুন্দরের সেই কবিজন-বর্ণিত চতুরস্র সৌন্দর্য্যের কথা—দেশবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন অনপনেয় ভাবে মুদ্রিত থাকিবে। শিক্ষার দোকানদারীর মধ্যে তিনি সারস্বত-কুঞ্জ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। রিপন কলেজে Professors' Union বা অধ্যাপক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা তাঁহার কীর্ত্তি। অধ্যাপকগণ যাহাতে মাত্র জীবিকার্জ্জনের জন্য—দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য একত্র না হন—পরস্পরের চিত্তবিনোদনের জন্য—চিত্তোৎকর্ষ বিধানের জন্যও যাহাতে সচেষ্ট থাকেন—তাহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

শুধু নিজে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া তিনি চরিতার্থতা বোধ করেন নাই। অপরকেও বাণী-সেবায় দীক্ষিত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই আজ আমার মত অনেকেই তাঁহার সেই উৎসাহ ও পরামর্শ দানের কথা—নিজ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার উদ্দেশে নতহৃদয় ও নতমস্তক।

(২১)

লেখক—অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্‌. এ

তাঁর বাপ-মা বোধ হয় যেন ভবিষ্যৎ জানিয়া নাম রাখিয়াছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর; কারণ, তাঁহার জীবনে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই সুন্দর'। আর সেই সৌন্দর্য্যের কথা অনেকেই আমার মত জানেন। মৃত্যুর মাস দুই পূর্ব্বে তাঁহাকে অসুস্থ জানিয়া আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি সানন্দে বিছানা হইতে উঠিয়া, দাঁড়াইয়া আমার সহিত কোলাকুলি করিলেন। আমি বলিলাম, আপনার এই ভগ্ন শরীরে উঠিয়া দাঁড়ান ভাল হইতেছে না। তাহাতে তিনি বলিলেন, এখনও দাঁড়াইবার ও কোলাকুলি করিবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু অদৃষ্টে যে আর এরূপভাবে কোলাকুলি করিতে অবসর পাইব, তাহা মনে করিতে পারি না।

তার কিছুদিন পরেই শুনিলাম যে, তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে। অনেকেই তাঁহার শরীরের এরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, কান্দীতে না যাইয়া এইখানেই শ্রাদ্ধাদি কর; কিন্তু তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া জন্মস্থান কান্দীতেই গিয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া আসিয়াছিলেন। কান্দী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, আর তাঁহাকে সেই শয্যা হইতে উঠিতে হইল না। মৃত্যুর দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু অনতিকাল পূর্ব্বে মৃত্যুযন্ত্রণার এক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে সাহসে কুলাইল না, ইচ্ছাও হইল না। নীচের ঘরে অনেক ভদ্রলোক ছিলেন,—সকলেই ম্লানমুখ, সকলেই স্তব্ধ। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুর অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে সভায় অনেকেই অনেক কথা ও অনেক গুণ বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু একটা বিশিষ্ট কথার উল্লেখ আমি করিতেছি। বহু কাল হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। আমিও তদ্রূপ সভ্য ছিলাম এবং এখনও আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গুরুভার তিনি বহন করিতেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তবে সেনেট সভায় তিনি প্রায়ই মুখ খুলিতেন না। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন—নীরবে কর্ম্মই করিতেন। বক্তৃতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে একবার ১৯০৪–১৯০৫ সালে যখন নূতন Regulation বা নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার স্থান যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহার জন্য কোন সভ্য প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালী সভ্যগণের মধ্যে এক রামেন্দ্রসুন্দর সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতা দেন। সেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিয়াছি। অনেক রথী মহারথী, যাঁহারা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এ প্রস্তাবে বিপক্ষবাদী ছিলেন। কাজেই ইহা গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, যখন সেনেটের হস্ত হইতে নিয়মাবলী প্রস্তুতকরণ তুলিয়া লইয়া, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তখন দেখা গেল যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সেনেটের অনভিমতেও উহার মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছে। যেদিন এই সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হয়, সে দিন রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লাস দেখে কে? সেই বিপক্ষবাদী মহারথিগণের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল সপক্ষবাদীর কাণ্ডারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এটা বড় সুখের বিষয় ও সুলক্ষণ। রামেন্দ্রের এই কীর্ত্তি বোধ হয়, অনেকেই জানেন না। তাই নিবেদন করিলাম।

(২২)

লেখক

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌. এ, বি এল্‌

রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম জীবনে অসামান্য ভাগ্য-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, এবং জীবনের অধিকাংশই তাঁহার অবিচলিত শান্তিতে কাটিয়াছিল, কিন্তু শেষ বয়সে ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবন ঘন শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে তাঁহার কন্যা পথ দেখাইয়া অনন্ত-যাত্রা করিলেন। তাহার পর আর দুইটি শোকের আঘাত উপর্য্যুপরি আসিল, এবং তাহার পরেই তাঁহার প্রাচীনা জননী ইহলোক ত্যাগ করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রের আসন্ন মৃত্যুশোকের হস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। অনন্তের পার হইতে তাঁহাদের আহ্বান শুনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। অল্প কালের মধ্যেই তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার বয়স সবে মাত্র ৫৫ বৎসর হইয়াছিল—১৮৬৪ সালের ২০শে আগষ্ট তাঁহার জন্ম, ১৯১৯ সালের ৬ই জুন তাঁহার লীলাবসান।

কিন্তু তাঁহার জীবন-লীলা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুসম্পন্ন। তিনি যে কীর্ত্তিকাহিনী রাখিয়া গেলেন, সেরূপ তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্য কেহই দেখাইতে পারিবেন কি না জানি না। যখন আমরা ভাবি যে, তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, কেমন বিনয়ী, অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী, শান্তিপ্রিয়, আত্মপ্রচার-বিরোধী ছিলেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হই যে, এরূপ লোকের দ্বারা এত কীর্ত্তি কিরূপে সম্পন্ন হইল? তাঁহার সফলতার রহস্য অনুসন্ধান করিলে আমরা প্রচুর শিক্ষালাভ করিতে পারি।

তিনি জীবনের আরম্ভেই লোক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সুদূর মফস্বল হইতে যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায়

প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, তখনই তাঁহার উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। পরে উপর্য্যুপরি সফলতা ও গৌরব অর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানগুলি আয়ত্ত করিয়া তিনি কলেজ ত্যাগ করিলেন। তিনি প্রথমে চাকুরীর কথা মনেও আনিতেন না, পরে যখন চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, তখন' এমন একটি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, যেখানে কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষক সকলেই তাঁহার স্বদেশবাসী।

ইহাতেই দেখা যায় যে, তিনি কত পূর্ব্বে এবং কত সূক্ষ্মভাবে নিজের আসল প্রকৃতি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং কত পূর্ব্বে ও কত সুদৃঢ়ভাবে তিনি তাঁহার আদর্শ গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি রামেন্দ্রের সহিত একই আইন-ক্লাসে মিলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই আইন অধ্যয়ন-ব্যাপার তাঁহাকে স্বকীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি সেখানে কেবল আমোদ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কখনও আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার সংকল্প করেন নাই এবং অল্প কালের মধ্যেই তিনি আইন-ক্লাসে যাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের পন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে তিনি বিচার-বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার হৃদয়ের আদেশবাণী, তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক প্রেরণারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রীতির নিবিড়তা ছিল।

স্বদেশপ্রীতিই আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল। তিনি দেশসেবায় স্বেচ্ছাবৃত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাঁহার নির্ব্বাচিত শস্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব বোধ করিতে, ও বর্ত্তমান অবনতিতে বেদনা পাইতে, তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অতীত ও বর্ত্তমানের এই সংমিশ্রণেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য

চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে একদিকে ছিল ঋষিসন্তান-সুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের দ্বন্দ্ব-কোলাহল, ক্রন্দনবিলাপের সজীব অনুভূতি। এই ভারত-প্রেমের দ্বারাই তাঁহার জীবন-চরিত ও কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথ সাহিত্য-সেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারকও হারাইয়াছি। ভারতের ভবিষ্য ঐতিহাসিক ভারতের নব ভাব-ধারা-আনয়নকারী ভাগ্যনিয়ন্তৃবর্গের মধ্যে তাঁহার যথাযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিবেন।

তিনি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন, তাহা কতকটা ভারত ভারত বলিয়াই, কিন্তু আরও ভালবাসিতেন, ভারত তাঁহার নিজের বলিয়া। ভারতের যাহা কিছু,—তাহার আকাশ-মৃত্তিকা, তাহার উদ্যান-প্রান্তর, তাহার হিমালয়, তাহার ভাগীরথী, তাহার কথাবিশ্রুত নরনারী, তাহার কবি ও দার্শনিক—সবেতেই তিনি গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার ভারত, বাল্মীকি-বুদ্ধের ভারত যে কালের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইল, এই যন্ত্রণাতেই তিনি ছটফট করিতেন। স্বদেশের সেবাই তিনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁহার অবস্থা অনুসারে এই সেবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি লেখনী সহযোগে তাঁহার ভেরী-নির্ঘোষ গদ্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া স্বদেশের সেবা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কখনও কাব্য-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমি বলিতেছি, তাঁহার কাণ ছিল না। তিনি প্রায়ই কোন বিষয়ে কখনও ভুল করিতেন না, সুতরাং আমি এমন কথা বলিতে সাহস করি না যে, তিনি নিজের শক্তির বিচার করিতে ভুল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উন্মাদনাপূর্ণ ছন্দো-

লীলায়িত গল্প পড়িয়া অন্যরূপ মনে হয়। যাহাই হউক, ইহাতে মানুষটিকে বেশ চিনিতে পারা যায়, তাঁহার সহজ-সংস্কারকে তিনি কেমন মানিয়া চলিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার আত্মসংযম ও তাঁহার নম্রতা, তাঁহার রচনারীতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি তাঁহার ব্রত-সাধনকল্পে যেমন অত্যাবশ্যক ছিল, তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি যেভাবে অল্প বয়স হইতেই অনুরাগবশবর্ত্তী হইয়া জীবনের একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া, যেরূপ অবিচলিতভাবে এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই তাঁহার জীবন ও কীর্ত্তি-কলাপের অর্থ পাওয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুতে নানা সম্প্রদায় নানা সভায় বিলাপ করিতেছেন ও তাঁহার যশোগান করিতেছেন; করিবারই ত কথা। তিনি বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন; জন্মভূমির ও মাতৃ-ভাষার তিনি পরম প্রেমিক ছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার তিরোধানে সর্ব্বাপেক্ষা আহত হইয়াছে—তাঁহার কলেজ।

ছাত্র-জীবনে অশেষ কীর্ত্তি ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইহার অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। তখন ইহার ছাত্রসংখ্যা আট শতের অধিক নহে; একটি হিন্দু গৃহস্থের আবাস-গৃহ এবং তৎসংলগ্ন একটি সুপ্রশস্ত খেলিবার ঘর, এই ছিল তখন কলেজ-ভবন; কলেজের গ্রন্থাগারে সামান্যই গ্রন্থ ছিল এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ছিল না বলিলেই চলে। তিনি রাখিয়া গেলেন, সুপ্রশস্ত হল-মণ্ডিত এক বিশাল কলেজ-গৃহ, সুন্দর ও সুপুষ্ট গ্রন্থাগার, সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রশালা এবং আঠার শতের অধিক শিক্ষার্থী। এই যে সফলতা, ইহা কেবল কালপরিণতির ফলমাত্র নহে, অক্লান্ত উদ্যম ও কঠোর প্রয়াসের দ্বারা এ সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কত শত বিঘ্ন-বিপৎ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কলেজ অভিভূত হয় নাই। প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই তাঁহার বিদ্যালয় সংবর্দ্ধিত দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল।

ইদানীন্তন স্বাস্থ্যভঙ্গবশতঃ তিনি অধিক কাল অধ্যাপনা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দণ্ডপ্রমাণ অধ্যাপনা অন্যের যুগব্যাপিনী অধ্যাপনার তুল্য ছিল। শাস্ত্রের দুরূহ অংশ বুঝিয়া লইবার আশায় ছাত্রেরা তাঁহার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকিত, ও তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া চরিতার্থ হইত। তাদৃশ বিমল বুদ্ধি, সরল হৃদয়, অথবা ব্যাখ্যান-কৌশল কোথায় মিলিবে? ছাত্রদিগের অভাব কোন কালে মোচন হইবে না। অধ্যাপকগণ তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ ছিলেন ও তাঁহার প্রতি পরম বিশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রভুত্বের ব্যবহার করিতে হইত না। সকলেই সানন্দে তাঁহার অব্যক্ত ইচ্ছার অনুসরণ করিত।

তাঁহাকে হারাইয়া ছাত্রেরা একজন সুপণ্ডিত ও প্রাঞ্জলভাষী শিক্ষক হারাইয়াছেন, অধ্যাপকবৃন্দ একজন সুপ্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক হারাইয়াছেন এবং সমগ্র রিপন কলেজ একজন দূরদর্শী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও কল্যাণকামী অভিভাবক হারাইয়াছে।

এত ভালবাসা, এত চিন্তা ধূলায় মিশাইয়া যাইতে পারে না। তিনি চিরকাল পূর্ণ শক্তিতে আমাদের অন্তঃকরণে সজীব থাকিবেন।
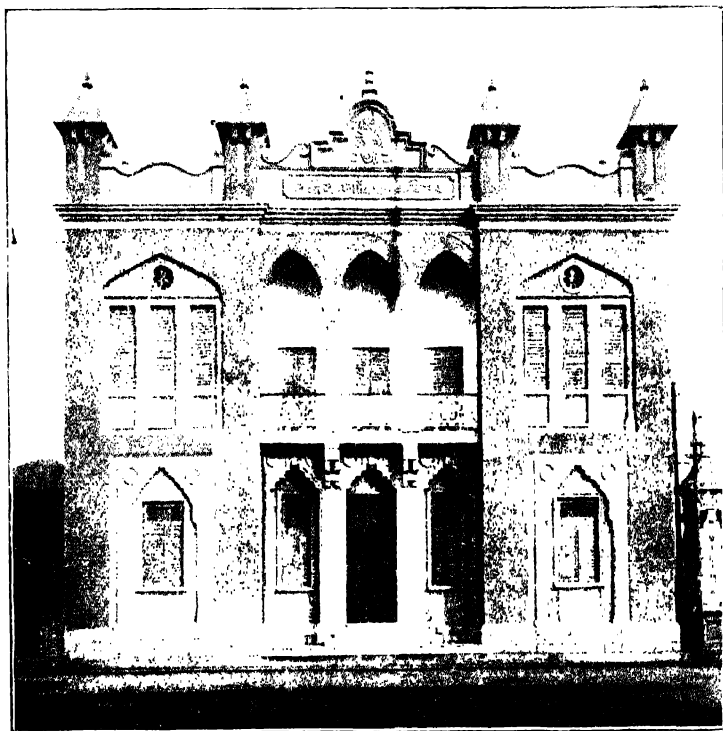
৺রামেন্দ্র বাবুর সাধের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-মন্দির

(২৩)

লেখক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

কল্যাণীয় শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন যেদিন ৺রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কি কি প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়, এই বিষয় লইয়া আমার সহিত আলোচনা করেন, সেই দিন এই আলোচনার সময় তিনি বলেন যে, রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেইগুলি এবং বাঙ্গালার আরও কয়েকজন বরেণ্য সন্তান দ্বারা রামেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য লিখাইয়া লইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সহ একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে কেমন হয়। কথাটা আমার তখন বড়ই ভাল লাগে। আমি তাঁহাকে বলি, কাজটা করিয়া তুলিতে পারিলে রামেন্দ্র-স্মৃতির একটি সুন্দর নিদর্শন ও বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্পদ্ সংরক্ষণের উপায় হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরেই দেখি যে, অদম্য উৎসাহে শ্রীমান্ কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। পুস্তক কিছুদূর ছাপা হইবার পর তিনি আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক হিসাবে আমাকেও কিছু লিখিয়া দিতে হইবে। তাঁহার অনুরোধ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া আমার দুই একজন বন্ধুও আমাকে কিছু লিখিতে বলিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম, তাঁহার রামেন্দ্র-প্রতিমা সাজাইবার জন্য যে সকল সাহিত্য-শিল্পী অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পার্শ্বে আমার স্থান নাই; কিন্তু শ্রীমান্ নিরস্ত হইবার পাত্র নন। বিশেষতঃ তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের ফলে, রামেন্দ্র বাবুর যে চিত্র-লেখা

আজ দেখিতেছি, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সমাবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আমিও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন আমি কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে রামেন্দ্র বাবু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই সূত্রে ছাত্রমহলে রামেন্দ্র বাবুর নাম খুবই প্রচারিত হয় এবং তখনই তাঁহার নামের সহিত আমি পরিচিত হই। তাহার পর "সাধনা" পত্রিকার মারফতে তাঁহার রচনার সহিত আমার পরিচয় ঘটে। "সাধনা"য় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি সাগ্রহে পাঠ করিতাম।

এই ঘটনার বহুপরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশন উপলক্ষে আমার পরমাত্মীয় ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয়ের সহিত ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে যাই। সে দিনের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধালোচনায় জনৈক শান্তসৌম্যমূর্ত্তি ব্যক্তিকে যোগ দিতে দেখি। তাঁহার আলোচনার অপূর্ব্ব প্রণালী ও ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি কে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মে। ব্যোমকেশ দাদা বলিলেন, ইনিই রামেন্দ্র বাবু। সভাভঙ্গের পর ব্যোমকেশ দাদা আমাকে রামেন্দ্র বাবুর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামেন্দ্র বাবুর সহিত ইহাই আমার প্রথম আলাপ। দু'চারি কথার পরেই তিনি অনুযোগ করিলেন—মধ্যে মধ্যে পরিষদে যাইয়া তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় কেন যোগ দিই না? সেই প্রথম দিনেই বুঝিলাম যে, আমার মত নগণ্য ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও যিনি পরিষদের কাজে লাগাইতে উৎসুক, সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে কত বড় ও কত প্রিয়। ভাষা-জননীর সেবার জন্য যে সমস্ত কৃতী সাহিত্য-সেবক তখন তাঁহার সহযোগী রূপে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমার

মত লোককে যে তাঁহাদের প্রয়োজন হইতে পারে, একথা তখন ভাবিতেও পারি নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনুরোধে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

ইহার কিছুদিন পরে পরিষদের কার্য্যালয় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে স্থানান্তরিত হয়। সেইখানে একদিন ভবিষ্যৎ সাহিত্য-পরিষদ্-ভবন কি আকারে নির্ম্মিত হইবে, সেই বিষয়ে রামেন্দ্রবাবুর সহিত ব্যোমকেশ দাদার আলোচনা হইতে থাকে। ব্যোমকেশ দাদা রামেন্দ্রবাবুকে বলেন, "আপনার কল্পনা-মত পরিষদ্-ভবন নির্ম্মাণ করিবার মত টাকা কোথায়?" উত্তরে রামেন্দ্রবাবু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"দেশের কাজে যদি টাকা পাওয়া না যায়, তা'হলে চলুন, সব বন্ধ ক'রে আমরা বাড়ী গিয়ে বসে থাকি।" রামেন্দ্রবাবুর এই কথায় তখনই বেশ বুঝিলাম যে, টাকার অভাবে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে, এ কল্পনাও তাঁহার কাছে অসহনীয়। পরিষদের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন রামেন্দ্রবাবুর আনন্দ-বিহ্বল মূর্ত্তি যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় আর কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না।

গৃহ-প্রতিষ্ঠার উৎসব শেষ হইয়া গেলে, রামেন্দ্রবাবু বলিলেন,— "ব্যোমকেশবাবু, গৃহের প্রতিষ্ঠা ত হইল, তাহার স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য যে ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে উপরে ১৯,৫০০৲ উনিশ হাজার পাঁচ শত টাকার আশা পাওয়া গেল। এই টাকাগুলি শীঘ্র আদায় ও বাকী ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই ১৯৫০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি মধ্যে লালগোলার রাজা বাহাদুরের ১০০০৲ হাজার টাকা দিবার কথা আছে, কিন্তু তিনি ঐ ৫০,০০০৲ টাকার এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। বাকী টাকা আমাদের শীঘ্রই সংগ্রহ করিয়া ফেলিতে হইবে। কাজেই আমাদের

অভিধান সঙ্কলন, প্রাচীন পুথি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, আসবাব প্রভৃতি সংগ্রহ, পুস্তকাগারকে পুষ্ট করা ও চিত্রশালাস্থাপন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী তহ-বিলের পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিতে হইবে। এখন হইতে আমাদের কাজকে প্রণালীবদ্ধ করা দরকার হইবে।” এই দিন হইতে জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার এই বক্তব্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় হইল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হইল না। সে সুযোগ তিনি নিজেই করিয়া লইলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি আমাকে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি সুযোগ মত আমাকে ঐ সমিতির একজন সদস্য করিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় আমাকে তাঁহার বাসায় যাইতে হইত, তথায় অনেকদিনই তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। পুরাণেতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব. বেদবেদান্ত প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি তিনি বিনা বিচারে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আরও একটা কথা, সর্ব্বত্রই তিনি বিভিন্ন মতগুলির সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হস্তী যেমন নিজের শরীর দেখিতে পায় না, রামেন্দ্রবাবুও তেমনই বোধ হয়, তিনি যে কত বড় পণ্ডিত, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার সরলতা, তাঁহার অহমিকাশূন্য অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়া দিত।

অসুস্থ অবস্থায় যখন তিনি নিয়মিতভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া পরিষদ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও, কখনও সফলকাম হই নাই। কথঞ্চিৎ সুস্থ

হইয়া, যখন তিনি পুনরায় পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিলেন, পরিষদের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিবার জন্য, তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়াই শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে সহকারী-সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। পরিষদের সেবায় কোনদিন তাঁহাকে অভিমান করিতে দেখি নাই।

আমার পরিষদের সহকারী-সম্পাদকত্ব গ্রহণের মূলেও রামেন্দ্রবাবু। ১৩২২ সালে যখন ব্যোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় অন্তিম-শয্যায় শায়িত, তখন রামেন্দ্রবাবুর ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ জানাইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আমি নিজে অযোগ্য ও আমার সময়াভাব থাকিলেও তাঁহাদের কথা অমান্য করিবার মত শক্তি আমার নাই, ইহা রাখালবাবুকে জানাইলাম,—ফলে পরিষদের সহকারী সম্পাদকত্ব আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল।

কি করিয়া কাজের লোককে বাছিয়া লইয়া, তাহার কাছ হইতে কাজ আদায় করিতে হয়, রামেন্দ্রবাবু তাহা বেশ ভাল করিয়া জানিতেন, সেই জন্য তিনি শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জনের উপর পরিষদ-সংক্রান্ত নানা কাজের ভার অর্পণ করিতেন। আর এইজন্যই ব্যোমকেশ দাদা তাঁহার প্রধান সহযোগী হইয়াছিলেন।

রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল যে, অনেক সাংসারিক কথাও তিনি আমার সহিত কহিতেন।

তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া আসি। তিনি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পরে নানা তর্কবিতর্কের পর সম্মত হন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্বীকার করাইয়া লন যে, যে কার্য্যের ভার তিনি আমার উপর অর্পণ করিবেন, আমাকে

তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আমার মত অনধিকারীকে পরিষদের ছাড়পত্র রামেন্দ্রবাবুই দিয়া গিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই যে, রামেন্দ্রবাবু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা, সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান ও বহুমূল্য জীবন একমাত্র বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া নানাবিধ নূতন তথ্যের আবিষ্কার পূর্ব্বক বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিতেন, কিন্তু এ সমস্তই তিনি সাহিত্য-পরিষদের কাছে বলি দিয়াছিলেন। কথাটি আমিও সম্পূর্ণ অনুমোদন ও বিশ্বাস করি। তবে আমার মনে হয়, মাতৃভাষার সেবা ও বাঙ্গালীর স্বারস্বত-নিকেতন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কল্পে এই যে অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদান ইহা কি একবারেই বিফল হইয়াছে? ইহার পশ্চাতে এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা না থাকিলে, পরিষদের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালী যদি অকৃতজ্ঞ না হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের নাম কালের অক্ষয়পটে চিরদিন সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন না হইলে জাতীয় ভাবের বিকাশ অসম্ভব, ইহা বুঝিতেন বলিয়াই রামেন্দ্রবাবু অসঙ্কোচে তাঁহার সমস্ত শক্তি সাহিত্য-পরিষদের সংগঠন ও সংরক্ষণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

লেখক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, বি এল্

অতি বাল্যকাল হইতেই রামেন্দ্রবাবুর নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম; কারণ যে সমাজে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের প্রধান কেন্দ্র জেমোকান্দী গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। এই সমাজের সহিত রামেন্দ্রবাবুর এত নিবিড় আত্মীয়তা ছিল যে, উত্তররাঢ়ীয় ছাত্রমাত্রই কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিত, এবং তাঁহার স্নেহ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইত। আমার পিতাঠাকুর মহাশয় রামেন্দ্রবাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন, কারণ তিনি জেমোকান্দী গ্রামে তাঁহার মাতামহীর নিকট থাকিয়া কাঁদীস্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু কলেজে অধ্যয়নকালে স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ আমি রামেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে সাহস করি নাই। ছয় বৎসর পরে যখন আমি কলেজের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতা জাতীয়-বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতা গ্রহণ করি, সেই সময় একদিন রামেন্দ্রবাবুর সম্মুখে পড়িয়া যাই। রামেন্দ্রবাবু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের একজন সদস্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ছেলেটি কে?" তিনি আমার নাম বলিয়া অন্যান্য পরিচয় দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রামেন্দ্রবাবু তাঁহার পরিচয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বহু পরিচিতের ন্যায় বলিলেন,—"রবি, এতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই কেন?" বুঝিলাম, আমি দেখা না করিলেও তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারি নাই। তিনি আমার সমস্ত খবরই রাখেন। অথচ সেই কান্দীস্কুল ছাড়ার পর ২৭ বৎসরের মধ্যে আমার পিতাঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

বাস্তবিকপক্ষে, তাঁহার চিত্তপটে বাল্যকালের স্মৃতি অতি উজ্জ্বল বর্ণে মুদ্রিত ছিল। পাঠ্যাবস্থার গল্প করিতে করিতে তিনি বালকের ন্যায় হইয়া যাইতেন। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন।

প্রথম আলাপের পর নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, সর্ব্বত্রই তাঁহার স্নেহসম্ভাষণ লাভ করিতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল যখন আমি রিপণ কলেজে অধ্যাপনাকার্য্য আরম্ভ করিলাম। তৎপূর্ব্বে সভাসমিতিতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু রিপণ কলেজে আসিয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে অভিভূত হইয়া গেলাম।

আমি জানিতাম, প্রচলিত যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর উপর তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না; অথচ তিনি রিপণ কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা আমি বাহির হইতে বুঝিতাম না। ভিতরে আসিয়া সে রহস্যের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম, কলেজের যে দিক্‌টা যন্ত্রধর্ম্মী, সে দিক্‌টা তিনি যন্ত্রবৎই পরিচালন করিয়া যাইতেন। কিন্তু ইহার সবটাই ত যন্ত্র নহে, যন্ত্রের মধ্যে যে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ শিক্ষক ও ছাত্র নাম লইয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার আসল কারবার ছিল এই প্রাণ-সমষ্টি লইয়া। ছাত্র সংখ্যা অপরিমেয়, সুতরাং তাহাদের সকলের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ পাতান অসম্ভব ব্যাপার; তথাপি যে অল্প কয়েকটি ছাত্র বি এস্-সি ক্লাসে তাঁহার বিজ্ঞান-ব্যাখ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। তিনি যে বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা করিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া যন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু প্রাণের কারবার চলে না!

তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞানশ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও, তিনি অনেকস্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি আফিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু রামেন্দ্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইত যে, প্রত্যহ অপরাহ্ণে যখন তিনি ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন সে ঘরে ছাত্রের ভিড় লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। ছাত্রদিগের সম্পর্কে তাঁহার কঠোর কোমল দুই মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। একদিকে যেমন দারিদ্র্য বা অক্ষমতাজনিত অভাব-অভিযোগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি দেখা যাইত, অন্যদিকে তেমনি নৈতিক অপরাধের দণ্ড-বিধানে তাঁহার বজ্রকঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। অপরাধী ছাত্রদিগকে জরিমানা করিয়া যে টাকা উঠিত, তাহা তিনি কলেজের সাধারণ অর্থকোষে না দিয়া, তদ্দ্বারা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন বিষয়ে অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবলমাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাহারা ভারতীয় ছাত্র; তাহাদের আচরণের উপর ভারতের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করিতেছেন। ছাত্রদের আনন্দমিলনে যোগদান করিতে তিনি ভালবাসিতেন। ফুটবল প্রভৃতি বিদেশীয় ক্রীড়ার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার ছাত্রগণ যখন খেলা

জিতিয়া তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইত, তখন তিনি তাহাদের আনন্দে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতেন, এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন না করাইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতেন না। বাস্তবিক তাঁহার গৃহে অভ্যাগত-সৎকার একটি প্রাণের ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার গৃহিণী যথার্থই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একবার তিনি কলেজের অধ্যাপক ও কতিপয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ, বৈচিত্র ও পাক-কৌশলে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। আহার-স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আপনারা নিঃসঙ্কোচে আহার করুন, ইহার মধ্যে রাঁধুনী বামুণের রান্না নাই, বা বাজারের সন্দেশ নাই।" অর্থাৎ প্রত্যেক সামগ্রী অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত তাঁহার বাড়ীর মেয়েরাই প্রস্তুত করিয়াছেন। না হইবে কেন, তিনি যে গৃহস্থালীর মধ্যে প্রাচীন-আদর্শানুযায়ী আশ্রম-ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কলেজের বিরাট্ যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক-নামধারী আর একদল যে মানুষ ছিল, তাঁহাদের সহিতই তাঁহার প্রধান কারবার ছিল। রিপণ কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্ খাসকামরা নাই, এ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টারদিগের নিকট তাঁহাকে অনেকবার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেন—,"আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া একা একঘরে কি করিয়া থাকিব?" খাসকামরা থাকিলে, কলেজযন্ত্রের কাজ চালান-পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ত এখানে শুধু কল চালাইতে আসেন নাই, সেটা ত একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি আসিতেন প্রাণবিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে। অপরাহ্ণে তিনি যখন আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার ঘরে একটা আনন্দলহরী ছুটিয়া চলিত। কখনও বা বৈদিকযজ্ঞ, কখনও বা ইহুদী-

জাতির ইতিহাস, কখনও বা প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধদর্শন, কখনও বা বৈষ্ণবতত্ত্ব, এইরূপ একটা না একটা বিষয় লইয়া সরস আলোচনা চলিত। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—নবীন অধ্যাপকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট্ যন্ত্রের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি যাহাতে আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেই ছিল তাঁহার প্রধান চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের মনের গতি লক্ষ্য করিতেন এবং কখনও প্রশংসা দ্বারা, কখনও প্ররোচনা দ্বারা, কখনও বা তিরস্কার করিয়া সকলকে বাণীর সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। "চর্চ্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ"—এই ছিল তাঁহার কথা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি এই সঙ্ঘে কোন আইন কানুন বাঁধিতে দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি প্রাণের স্বচ্ছ লীলা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে হয় তিনি নিজে অথবা কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতেন। হয় ত বা বাহির হইতে দুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আনা হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শুশ্রূষু তাহাদিগকেও ডাকা হইত। সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত, এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টান্ন জলযোগ সহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত। এই অধ্যাপকসঙ্ঘের সম্মুখে তিনি যে ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি "জগৎকথা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে,

পাশ্চাত্যজগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে তাঁহার আর একটি প্রিয়বস্তু ছিল "রিপণ-কলেজ-পত্রিকা"। এই পত্রিকা তাঁহারই উৎসাহে ও নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, রামেন্দ্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে কেমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছাঁচে সকলকে ঢালিতে চাহিতেন না। কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্ বিষয়ে কাহার স্বাভাবিক অনুরাগ এইটি লক্ষ্য করিয়াই তিনি কথা কহিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার চিত্তের উদারতা দেখিয়া অবাক হইতে হইত। কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য যখন গ্রন্থ ক্রয় করা হইত, তখন তিনি কেবল নিজের রুচি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থনির্ব্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ যে তাঁহার প্রিয় হইবে তাহা ত স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আধুনিক ইউরোপের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক—কিছুই তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। নবীন অধ্যাপকেরা যে সকল অতি-নবীন কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে না পাঠ করিলেও তাঁহাদের নিকট সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম শুনিয়া লইয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন রচনা নূতন প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসোঁর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।

রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-ক্ষেত্রেও মিলিত

ছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর কথা লিখিতে গেলে, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য মহারথিগণ সে কথা বিস্তার করিয়া লিখিবেন। তাঁহার দেশসেবা ও সাহিত্যসেবার ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত, দেশের চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে তিনি কোন্ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন সে কথা আলোচনা করিবার জন্য অনেক সুযোগ্য মনীষী আছেন। আমি শুধু রিপণ কলেজের নিভৃত ঘরের কোণে বসিয়া তিনি কি গৃহস্থালী করিতেন, সেই ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছি। সে কথাও যে সব বলা হইল তাহা নহে, তবে ইহাতে যদি রামেন্দ্রবাবুর পরিচয় লাভের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করে, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

---

(২৩)

লেখক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ

যখন কলেজে পড়িতাম, তখন হইতেই মাসিক পত্রিকাদিতে রামেন্দ্রবাবুর লেখা পড়িয়া এমন একটা অপূর্ব্ব মনীষার পরিচয় পাইয়াছি, যে মনীষা ঠিক সে ভাবে অন্য কোনও বাঙ্গালীর লেখায় ফুটিয়া উঠে নাই, এবং অন্যক্ষেত্রে যাহার তুলনা শুধু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাওয়া যায়। পড়িবার সময় হইতেই সেই মনীষার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছিল। তারপর নিজের সামান্য অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য লইয়া যেদিন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মন্দিরে পূজা করিতে আসিলাম, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যজ্ঞবেদী ঘেরিয়া যে সব প্রধান ঋত্বিক্‌গণকে দেখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে আমার এতদিনের কল্পনায় নির্ম্মিত, ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রদ্ধায় অর্চ্চিত সেই মনীষার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তিটিকেও সত্য সত্যই চোখে দেখিলাম—আমার মানসা-পূজা এতদিনে সাক্ষাৎকারের সিদ্ধিতে পৌঁছিয়া সুস্থির ও ধন্য হইল। তারপর জাতীয় শিক্ষামন্দিরে পবিত্র হোমাগ্নির চারিধারে যে সমস্ত কণ্ঠ মিলিয়া আমাদের দেশমাতৃকার পূজায় দেবীসূক্তমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্বরগাম্ভীর্য্যে ও ছন্দো-বৈভবে রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠই বোধ হয় সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়াছিল—দেশমাতৃকার আবাহনে এমন দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন, অবিকৃত সুর ও ছন্দ আর কাহারও কণ্ঠে শুনিয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় না। শুধু কি তাহাই? সে হোম-বহ্নিতে অনেককেই অঞ্জলি পূরিয়া আহুতি দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রামেন্দ্র-

সুন্দরের অঞ্জলি যেমন ধায়া হৃদয়ের সকল মমতা, সকল শ্রদ্ধা ও সকল আশা দিয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার অনুষ্ঠান যেমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল, তেমনটী হইতে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তার পর আবার নানা গোলযোগে ও উপদ্রবে যখন জাতীয়শিক্ষার যজ্ঞশালার পুরোহিতেরাও ক্রমশঃ স্বাধ্যায়-মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি ভুলিতে বসিলেন, পূজার্থীর দলও যখন ক্রমশঃ ভিতরের গোলযোগ ও বাহিরের দুর্য্যোগ দেখিয়া মন্দিরদ্বার হইতে অর্ঘ্য নৈবেদ্য ফিরাইয়া লইয়া চলিল, তখন দেশমাতৃকার মহাপূজা পণ্ড হইতে বসিল ভাবিয়া, যে ঋষিকল্প পুরোহিতের প্রসন্নোজ্জ্বল ললাট সকলের চেয়ে বেশী মর্ম্মান্তিক বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন—রামেন্দ্রসুন্দর। এই আর্য্যভূমির বাস্তুদেবতাটিকে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন খাঁটী ভাবে ভালবাসিয়া গিয়াছেন, এবং সেই ভালবাসা প্রধানতঃ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ ও সাহিত্য-পরিষৎ এই দুইটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমন খাঁটী ভালবাসা ও তাহার তেমন সুন্দর পরিচয়, আমাদের অনেক বড় বড় অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের মধ্যেও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, আমরা না চিনিয়া, না জানিয়াই 'দেশকে ভালবাসি' একথা বলিয়া থাকি; যেখানে ভালবাসার পশ্চাতে কতকটা সত্যকার পরিচয়ও বা আছে, সেখানে সে ভালবাসাকে ভাব-সাধনা ও কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়া সুন্দর ও সফল করিয়া লইবার অধিকার অনেকে সাব্যস্ত করিয়া লইতে পারেন নাই। রামেন্দ্র-সুন্দরের দেশাত্মবোধের পশ্চাতে দেশাত্মার সম্যক্ বোধ ছিল, এবং দেশটা যাহাতে দেশাত্মার স্বরাজ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সে পক্ষে ভাবিবার মাথা, লিখিবার কলম এবং খাটিবার ঝোঁক রামেন্দ্রসুন্দরের একাধারে যেমন ছিল, তেমন অপর কাহারও দেখি নাই।

এ সব কথা আমি আর বিস্তারিত করিয়া বলিতে যাইব না। রামেন্দ্র-সুন্দর ভাবিয়া গিয়াছেন কি, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করিব। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের যজ্ঞশালায় যেদিন মন্ত্রবিস্মৃতি ও অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়া পড়িয়া আমাদের মত দীন সেবকের কর্ম্মসঙ্কোচ করিয়া দিল, সেদিন রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার নিজের অপূর্ব্ব ভাবসাধনার পুণ্যক্ষেত্রের একপ্রান্তে টানিয়া লইলেন—আমাকে রিপণ কলেজে ব্রতী করিয়া দিলেন। কালেজের চাকুরী উপলক্ষ্য মাত্র—রামেন্দ্রবাবু তাঁহার নিজের শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির চারিধারে যে নির্ম্মল, শান্ত, পবিত্র বায়ুমণ্ডল রচিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বায়ুরাশি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বক্ষ ভরিয়া বাহিয়া আনিবার সুযোগ তিনি আমায় দিলেন। বহু অপরাহ্ণ কলেজের কক্ষে সে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ভাবদেহের ও চিন্তাদেহের অনেক দূষিত, তরল রক্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল ও সতেজ হইয়া উঠিতেছে। লেখা পড়িয়া যাহার অঙ্কুর মাত্র হইয়াছিল, সেই মধুবর্ষী স্নিগ্ধ বায়ুমণ্ডলে থাকিয়া তাহাই পরিপুষ্ট, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রামেন্দ্রবাবু আমার সঙ্গে তাঁহার গভীরতম চিন্তাগুলি মাপাজোকা লইতে ভালবাসতেন। তাঁহার এই চিন্তাগুলির বিষয় "জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি লেখার মধ্যে আছে, কিন্তু তাদের বিশদ পরিচয় আমরা পাই শেষ প্রবন্ধগুলিতে—যেগুলি "ভারতবর্ষে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া সম্প্রতি "জগৎকথা" নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তাঁহার আসল কথাটি এই প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়াই বলিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে কথাটি তিনি বলিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে যে টুকু বলিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যেই সিদ্ধান্তের একটা সূত্র, তত্ত্বের একটা ইঙ্গিত, তিনি ফেলিয়া রাখিয়া

গিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার "মুক্তি" "যজ্ঞ" প্রভৃতি লেখা পড়া থাকিলে সে সূত্র বা ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়া পথ হারাইবার আশঙ্কা নাই। আমি কলেজের ম্যাগাজিনে রামেন্দ্রবাবুর "জগৎকথা"র উপর টীকা-টিপ্পনী লিখিতাম—সেগুলি লিখিতে স্বয়ং রামেন্দ্রবাবুই আমায় সাহস দিয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্পষ্ট করিয়াই নানা জায়গায় বলা হইয়াছে। আমি তাঁহার গোড়ার মাত্র দুটা একটা কথা শুনাইব।

রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তেমন পরিষ্কার মাথা ও অসাধারণ মনীষা লইয়া পশ্চিম দেশের বিজ্ঞানক্ষেত্রে কেহ দেখা দিলে, তিনি একজন ম্যাক্সওয়েল বা কেল্‌ভিন্ না হইয়া যান না। কিন্তু বর্ত্তমানে এ দেশের ভাবের মাটি যেরূপ অসার ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে রামেন্দ্র-বাবুর মত প্রতিভাও যে তেমন বিশাল পরিপুষ্টিতে পৌছিয়া আশানুরূপ ফলবান্ বিজ্ঞানকল্পতরু হইতে পারে নাই, ইহাতে আপশোষের কারণ থাকিলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। রামেন্দ্রবাবু যেমন বিজ্ঞান বুঝিতেন ও বুঝাইতেন, তেমন আর কেহ এ দেশে পারিয়াছেন কিনা জানি না; তবে তাঁহার যেমন মাথা ছিল, তাহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানের সৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁর একজন প্রজাপতি হওয়াটাই উচিত ছিল। নিউটন, ডারউইন, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি এইরূপ এক একজন প্রজাপতি। যাঁহারা সাক্ষাৎ-ভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও, বিজ্ঞানের বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথ ভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানের ঋষি; আর যাঁহারা শিষ্য যজমানের কল্যাণ কামনায় সেই মন্ত্রগুলির যথাযথ বিনিযোগ করিতে পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের আচার্য্য ও পুরোহিত। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না। আচার্য্য এবং

পুরোহিত হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি অতুলনীয়—তিনি যেমনভাবে তাঁহার লেখায় ও অধ্যাপনায় বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছেন, তেমনভাবে বুঝাইতে আর কাহাকেও শুনি নাই। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের আর এক প্রমাণ—তিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্রগুলি সাদা বাঙ্গালায় আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, সেগুলি পশ্চিমদেশের সাধা বুলিতেই কেবল বিবৃত হইতে পারে, ইহাই অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার। যাহা হউক, রামেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের ঋষি ও পুরোহিত হইয়াও যে প্রজাপতি হইয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য।

কিন্তু এক হিসাবে বিজ্ঞানকে পরখ করিয়া লইবার, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করিয়া লইবার, একটি নূতন দিব্যচক্ষু তিনি আমাদেষ জন্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এই হিসাবে তাঁহাকে প্রজাপতি ভাবিলেও অসঙ্গত হইবে না। সেই দিব্যচক্ষু প্রাসাদাৎ আমরা দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞানের বিরাট্ পুরী মর্ম্মরনির্ম্মিত হইলেও সত্য সত্যই উহা মায়াপুরী। উপনিষদের শ্বেতকেতু প্রভৃতির যে বিজ্ঞান তাহার কথা বলিতেছি না, তবে পশ্চিমদেশের যে বিজ্ঞান, তাহার বিশাল আয়তনটা যে গড়িয়াছে সে ময়দানব! সত্যসত্যই হাওয়ার উপরে সেই বিশাল সৌধটা গড়িয়া উঠিয়া আমাদের ভাববিশ্বাসকে তাহারই ক্ষুধিত পাষাণের চারিধারে মায়া-ডোরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এবং আমাদিগকে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া গোলাম বানাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানের দুয়ারে আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস বাঁধা, বিজ্ঞানের নামে আমাদের বিচার-শক্তি একেবারে পঙ্গু। এই কুহকের ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া বিজ্ঞানের আসল চেহারাখানি দেখাইয়া দিয়াছেন—আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর। ভারতবর্ষে বেদপন্থী-সমাজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা তাঁহার এইখানে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও বৈদান্তিকের দৃষ্টি না পাইলে কেহ

বিজ্ঞানের ভেল্কি ধরিয়া ফেলিতে পারে না। তেমন বুদ্ধি ও দৃষ্টি রামেন্দ্রবাবুর মত আর কাহার ছিল ?

বিজ্ঞানের গোড়ার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা পশ্চিমদেশেও একটু-আধটু যে না হইয়াছে, এমন নয়। বিজ্ঞান দেশ, কাল, জড় ও শক্তি লইয়া প্রধানতঃ কারবার করে। দুই জন্ ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ করিয়া এই কয়টা আসল মসলা লইয়া বিজ্ঞানের মায়াপুরী গড়িতেছেন,—ইঁহাদের এক জনের নাম পর্য্যবেক্ষণ, অপরের নাম গণিত। পরীক্ষা ও গণিত-বিদ্যা মিলিয়া মায়াপুরী গড়িতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা একদেশের লোক নহেন। গণিত-বিদ্যা এক অবাস্তব ধ্রুবলোকে অচলায়তন গড়িয়া বাস করেন, ইহলোকের ধূলাকাদা লইয়া ঘাঁটা তিনি ইতরের কাজ মনে করেন। কল্পিত বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্ত, বৃত্তাভাস প্রভৃতি তাঁহার সম্পত্তি। ইনি খাঁটী গণিত। সময়ে সময়ে ইহলোকের জড় পদার্থ, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়াও গণিত কারবার করেন বটে; কিন্তু কারবার করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া সেগুলিকে অতীন্দ্রিয়, আজগবী জিনিষ বানাইয়া লন। তখন ইনি মিশ্রগণিত। ইনি যে লাটিম ঘুরাইয়া থাকেন, যে দোলক দুলাইয়া দেন, যে তার কাঁপাইয়া থাকেন, সে লাটিম ধ্রুবলোকের শিশুরাই বোধ হয় ঘুরাইতে পান; সে দোলকের দোল খাইয়াছেন বোধ হয় নারায়ণের নাভি-কমলোপরি আসীন একমাত্র লোক-পিতামহ; আর সে তার শুধু বাগ্‌দেবী বা দেবর্ষি নারদের বীণাযন্ত্রেই বিন্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের পরিচিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলি ঠিক স্বভাবে থাকিয়া গণিত-বিদ্যার কাছে ঘেঁসিতে পারে না। গণিত-বিদ্যা যে মন্ত্র আওড়াইয়া আমাদের অনুভবের জগৎটাকে শুধু একটা কল্পিত, বাঙ্ময় জগৎ করিয়া দেন, সে মন্ত্রগুলিকে বলে ফর্‌মিউলা। এই ফর্‌মিউলা-রাক্ষসীর দন্তপংক্তির

যেরূপ তীক্ষ্ণতা ও বহর, তাহাতে আমাদের কোনও সত্যকার অনুভবই ইহার কাছে অক্ষত-দেহ ও অবিকৃত-মূর্ত্তি থাকিয়া পালাইতে পারে না। যে জিনিষটা তাঁর ফর্‌মিউলার পেষণ-যন্ত্রে ফেলিয়াছেন, সে গণিত জিনিষটা আর স্বরূপে বাহাল থাকিতে পারে না। পশ্চিম দেশের ম্যাক, পোঁয়াকারে, কার্ল, পিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ রহস্য ক্রমশঃ ধরিয়া ফেলিতেছেন; সম্প্রতি আবার আইনষ্টাইনের দল যে ভাবে দেশ ও কাল লইয়া ঢালা-ওপর করিতেছেন, তাহাতে গণিতের একেবারে গোড়াতে গিয়াও ভরসা নাই। আমাদের অপরা-বিদ্যার আগাগোড়াই আপেক্ষিক—নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য সম্ভবতঃ ইহার কোনখানেই নাই। ইহাই হালের টাট্‌কা খবর—রামেন্দ্র বাবু তাঁহার সরল ও অপূর্ব্ব ভাষায় বৈদান্তিকভাবে এ খবর আমাদের পূর্ব্বেই শুনাইয়াছেন। গণিতের গোড়ার কথাগুলি লইয়া রামেন্দ্র বাবু যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব কথা পশ্চিমের বিচারকেরাও ভয়ে-সঙ্কোচে কতকটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু রামেন্দ্র বাবুর বৈদান্তিক দৃষ্টি স্বচ্ছ ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। তাঁহার পদনিম্নে একটা ভূমি সুস্থির ছিল—সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি একটা কিছু গড়িতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পশ্চিমে প্রায়ই দেখিতে পাই, বিজ্ঞানের জ্ঞানবিশ্বাস ও মতবাদগুলি পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া চুরমার হইতেছে; পাকা বনিয়াদের উপর কোন একটা কিছু কায়েমি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না। ইহার হেতু—পশ্চিমের জড়-বিদ্যা এখনও ব্রহ্মবিদ্যার তল্লাস পায় নাই; অপরা-বিদ্যা নানা স্রোতে নানা দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এখনও পরা-বিদ্যার সুস্থির মাটিতে নিজের শিকড় চালাইয়া দিয়া বসিতে পারে নাই।

পদার্থ-বিদ্যার অপর একজন ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা। আমরা মনে ভাবি, পরীক্ষা করিয়া বুঝি আমরা ইহলোকের খাঁটি খবর পাইব।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া ইহলোককে যে ভাবে দেখেন, তাহাই ইহলোকের আসল চেহারা। রামেন্দ্র বাবু এ ভুলও ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক নিজের অনুভব, নিজের যন্ত্রপাতিতে প্রত্যয় যান না; তিনি কল্পিত "মাঝারি মানুষ"কে ডাকিয়া "আদর্শ" যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখিবার ব্যবস্থা দেন। কিন্তু মাঝারি মানুষ কোথায় বিচরণ করে, আদর্শ যন্ত্রপাতি কোন্ বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় তৈয়ারি হয়, তাহা কে বলিবে? অতএব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সত্য গড়কষা সত্য—আমাদের নিজের নিজের সাক্ষাৎ উপলব্ধ সত্য নহে। সুতরাং পাইতেছি যে, পদার্থ-বিদ্যার দুই কারিগরই হাত সাফাই দেখাইতে মজবুত। মালমসলাগুলাও নিরপেক্ষ, অসন্দিগ্ধ নহে। ফলে পাইতেছি, বিজ্ঞানের মায়াপুরী—যাহা রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিনাইয়া গিয়াছেন। কল্পিত সর্পের একটা আশ্রয় ত চাই, রজ্জুকে আশ্রয় করিয়াই ত সর্প-ভ্রান্তি। মায়ারও একটা অধিষ্ঠান চাই। যে সত্যকার অধিষ্ঠানের উপর বিজ্ঞান তার মায়াপুরী তুলিয়াছে, সেটা এমন একটা বস্তু, যেখানে সন্দেহ অবকাশ পায় না, যেখানে দাঁড়াইয়া "অপর" কিছুর আর অপেক্ষা নাই। সেই নিরপেক্ষ বস্তুটিকে রামেন্দ্রসুন্দর ডাকিয়াছেন, "আমি" বলিয়া—বেদান্ত বলিবেন, আত্মা। আমি নিজে যা কিছু ঠিক যেমন ভাবে অনুভব করিতেছি, সেই সব জড়াইয়া আমার আমিত্ব—আমার "প্রাতিভাসিক জগৎ।" বেদান্তের এই পারিভাষিক কথাটাকে রামেন্দ্রবাবু একটু বিশেষ অর্থে লইয়াছেন। যাহা হউক, আমার নিজের অনুভবের মধ্যেই সব—তুমি, সে, নিখিল জগৎ—এই নিজস্ব অনুভবের মধ্যেই রহিয়াছে। আমি যে ভাবিতেছি—তোমরা আমার পর এবং বাহিরে রহিয়াছ, সে ভাবনা আমার ভিতরেই হইতেছে; কাজেই "আমার" বাহিরে আর জগৎ নাই। তারপর এই "আমি"র কি জানি কেন খেয়াল হইল—আমার একটা

ভিতর-বাহির থাকিবে। এই খেয়ালের বশে তিনি নিজেরই খানিকটা "বাহির-বাড়ী" করিয়া দিলেন। এই যে একটা বাহির ভাবিয়া লইয়া সেখানে নিজেরই খানিকটা বিসর্জ্জন করা, ছুঁড়িয়া ফেলা, বলি দেওয়া, এই ব্যাপারটার নামই যজ্ঞ। "আমি" যজ্ঞ করিয়া এই জগৎ ও আমার মত সব জীব সৃষ্টি করিয়াছি। এই যজ্ঞের ফলে "তুমি" ও "সে" আমা হইতে স্বতন্ত্র। আমি স্বতন্ত্র ভাবিব, এইরূপ খেয়াল করিয়াছি বলিয়াই স্বতন্ত্র, নহিলে আমার বাহিরে আলাহিদা কেহ বা কিছুই নাই। যাহা হউক, "তুমি" ও "সে" দেখা দিবার পর, তোমাদের সঙ্গে কারবার করার আমার বাসনা হইল। তুমি ও আমি কারবার করিতে বসিয়া কিছু কিছু হাতে রাখিয়া কারবার করি। তোমার নিজস্ব অনুভব জগৎ এবং আমার নিজের অনুভব জগৎ ঠিক হুবহু মিলিয়া যায় না। আমি যে কালে মাথাধরার কষ্ট পাইতেছি, তুমি সে কালে হয় ত সুস্থচিত্তে কেশবিন্যাস করিতেছ। আমার মনে এক রকম, তোমার মনে আর এক রকম। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে অমিল থাকিলেও, মিলও যথেষ্ট আছে। এই কাগজখানা তুমিও যে ভাবে দেখিতেছ, আমিও প্রায় সেই ভাবে দেখিতেছি। মেঘ ডাকিলে দু-জনেই শুনিব। আমাদের অন্দর-বাড়ীতে পরস্পরের প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু যে বাহির-বাড়ীতে বসিয়া আমরা পরস্পরের সঙ্গে কারবার করি, সেই বৈঠকখানা, সেই মেলামেশার জায়গা হইতেছে "ব্যাবহারিক জগৎ"। আমরা এই ব্যাবহারিক জগতে থাকিয়া পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করি, এবং আমাদের সকল কর্ম্ম ও সকল বিদ্যা এই ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার লেখায় এই কথাটা খুব খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এমন খাঁটি বেদান্তের কথা অকুতোভয়ে আর কেহ এমন ভাবে আমাদের সাম্‌নে ধরিয়াছেন কি? পাশ্চাত্য দর্শনের বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ রামেন্দ্রবাবুর অনেক

লেখার উপরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মাথার খুলির ভিতর হাজার হাজার বছরের পুরাণো রক্ত যে চিন্তাটিকে বিশেষভাবে যোগাইয়াছে, সে চিন্তার মূল আমাদের বেদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাই, পশ্চিমে নহে। তিনি সে চিন্তার এত গোঁড়া ছিলেন যে, তার সঙ্গে অসমঞ্জস বুঝিলে কোন ব্যবস্থাকেই তিনি আমল দিতেন না—যথা দলবদ্ধভাবে বৈরাগীর ধর্ম্ম।

---

(২৪)

লেখক—শ্রীযুক্ত স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্‌

আমি যখন 'সাধনা'র সম্পাদক ছিলাম, তখন স্বর্গীয় রামেন্দ্রস্বন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখার প্রথম পরিচয় লাভ করি; ইহার পূর্ব্বে তাঁহার একটি মাত্র প্রবন্ধ বোধ হয় 'নবজীবনে' ছাপা হইয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম, ইনি একজন যে-সে সহজ লেখক ন'ন; তাহার পর যে দিন ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, ইনি একজন যে-সে সহজ লোকও ন'ন। ত্রিবেদী মহাশয় একজন মার্কা-মারা, সকল বিষয়ে ছাপ রাখিয়া যাইবার মত লোক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর জীবনে, বাঙ্গালার মাটীতে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত জনের মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ভুলিবার জো নাই। তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সেবা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার বন্ধুপ্রেম, তাঁহার পবিত্র স্বন্দর জীবন চিরদিন স্বন্দর ফুলের মতই ফুটিয়া থাকিবে। ত্রিবেদী মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালীর বেশভূষা করিতেন, তিনি বাঙ্গালীর কলেজে পড়াইতেন, তিনি বাঙ্গালীর মত সরলভাবে সরল প্রাণে সকলের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন যাপন করিতেন, তিনি বাঙ্গালা দেশকে ধন্য করিয়াছেন। আজ এই নন্‌-কো-অপারেশনের কোলাহলের দিনে ত্রিবেদী মহাশয় একজন অনু-করণীয় স্মরণীয় পুরুষ। ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা আমার মনেই আছে—শুধু দুই একটি কথায় আমার মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি।

(২৫)

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

১৯০১ সালে আমি যখন রিপণ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে সৌম্য-শান্তমূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন, পূজনীয় রামেন্দ্রবাবুর প্রথম সাক্ষাৎলাভ করি। সে সময়ে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট এই বৎসর একটি স্মরণীয় বৎসর। কারণ, কেবলমাত্র এই বৎসরেই অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের পদতলে বসিয়া রসায়ন-পাঠের সুযোগ ও সুবিধা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর যে একটু বিশেষত্ব ছিল, তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে উত্থাপন করিতে চাই। রসায়নবিদ্যার হাতেখড়ি এই সময়েই আমাদিগকে করিতে হয়। নূতন বিদ্যার উপর বক্তৃতা দিয়া, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা সহজসাধ্য নয় বিবেচনা করিয়া, তরলমতি যুবকদিগের মনে রসায়ন-প্রীতি জাগাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীকে আমরা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সে পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রদর্শন (Practical Experiments)। বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে নূতন পদার্থ উৎপাদন করিয়া তিনি আমাদিগের মনকে 'নূতনের' দিকে আকৃষ্ট করিতেন। নূতনের মোহে আমরা নূতন জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শন-জনিত আনন্দ আমাদিগের কৌতূহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র করিত। আর সকলেই স্বীকার করিবেন, এই কৌতূহল-সৃষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কৌতূহল না জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কি, তাহা জানিতে পারা

যায় না। এই জিনিসটা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রথমে পরীক্ষা দেখাইয়া, পরে পরীক্ষিতব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন। আর বোধ হয়, এই কারণেই আমি বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

যথাসময়ে আমি এফ-এ পাশ করিয়া উক্ত কলেজেই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। পাশ ও অনার্সে রামেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, বরাবরই তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রচলিত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া—গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসান না দিয়া, তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিতেন। আমরাও বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতাম। ইংরাজী ভাষাতে পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া, তিনি বাঙ্গালায় বর্ণিত বিষয়গুলি আবার ইংরাজীতে বলিতেন। যাঁহারা তাঁহার পদতলে বসিয়া পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, পদার্থ-বিদ্যার জটিল বিষয়গুলি (Mathematical portions) দুরূহ অঙ্কপাত (Higher Mathematics) ব্যতিরেকে সহজে শিক্ষা দিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন—বোধ হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন না। আমার বোধ হয়, Tait-এর Heat নামক পুস্তকের তাপতত্ত্ব (Thermodynamics) নামক দুর্বোধ্য অংশ সহজ সরলভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইতে তাঁহার মত কেহ পারেন কি না সন্দেহ।

পাঠ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে কথাচ্ছলে এক দিন তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত

করিয়া দিলাম,—"আমার পাঠ্যাবস্থায় কোন পাঠকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বে উহা আমি নিজের হাতে খাতায় লিখিতাম—লিখিয়া মিলাইয়া দেখিতাম। কোন জিনিসটা বুঝিয়া উহা লিখিতাম, তারপর আমার লিখিত অংশটি ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিতাম। এই ভাবে ছাত্রাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া আসিয়াছি।" "Writing makes a man perfect" বলিয়া যে প্রবচন আছে, তাহার যাথার্থ্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয় একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু দু'টি বড়ই সুন্দর ছিল। একদিন তিনি অনার ক্লাসের বোর্ডে নানাপ্রকার নক্সা আঁকিয়া আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সপ্তম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর বালক বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। ত্রিবেদী মহাশয় ফিরিয়া বালকটির মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিবামাত্র সে ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। ত্রিবেদী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও অমন ভাবে চেঁচাইয়া পলাইয়া গেল কেন?" আমি বলিলাম, "সার, আপনার চাহনিতে ওর আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেছে, তাই ও চেঁচিয়ে পালিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া তিনি যে ভাবে হাসিয়াছিলেন, সেরূপ প্রাণ-খোলা হাসি আমি আর দেখি নাই। আমার উত্তর শুনিয়া তিনি ছাত্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে বলিলেন; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বোধ হয়, তত ক্ষণে সে বেচারা ক্লাশে ঢুকিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

মাতৃভাষার অনন্যসাধারণ সেবক রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যাপনার সময় ক্লাসে কথনও মাতৃভাষার আলোচনার জন্য কোন দিন কোন কথাই

বলিতেন না। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতেন না; কিন্তু যে সকল ছাত্র অধীত বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য বা যে কোনও কারণেই হউক, তাঁহার বাটীতে যাইত, তখন তিনি তাহাদিগকে মাতৃভাষার অনুশীলন জন্য উপদেশ দিতেন—মাতৃভাষাকে তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে বলিতেন—কবির কথায় বলিতেন, 'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা।" আর একটা কথা বলিতেন—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিবার জন্য। তিনি বলিতেন, "উহা আমাদিগের মাতৃমন্দির, আমরা ওখানে বঙ্গবাণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি —যাহার যতটুকু শক্তি, মার পূজার দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হও।" এই মাতৃভাষার সেবা ও সাহিত্য-পরিষদের সেবার প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে একমাত্র তিনিই জাগাইয়া দিয়াছেন, এ জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী।

ত্রিবেদী মহাশয়কে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে পরম হিন্দু বলিয়াই জানি। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে না কি তিনি নাস্তিকবাদী ছিলেন। হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও নিষ্ঠার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি শ্রদ্ধার সহিত সেগুলির অধিকাংশের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সেগুলি গভীর জ্ঞানপ্রসূত, আমাদিগের জাতির কল্যাণকর। তাই যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" পড়িলেন, তখন মর্ম্মাহত হইয়া, বলিয়াছিলেন, 'একটা জবাব দিতে হবে।' কিন্তু জানি না, কেন তিনি উহার জবাব দেন নাই। তাঁহার বৈদিক যজ্ঞের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক নাস্তিক আবার আস্তিক হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

———

(২৬)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের লেখনী যেন সোণার কাঠি। এই সোণার কাঠির স্পর্শে নীরস বিষয়ও সরস হইয়া উঠিত। তিনি "শব্দকথা"য় শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও পরিভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া লিখিয়াছেন, তাহার তুলনা বাঙ্গালা ভাষায় বোধ করি আর নাই। তাঁহার "ধ্বনিবিচার" প্রবন্ধে তিনি যে অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎ মাত্রেরই আদরের বস্তু। ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধে যে এত কথা বলা যাইতে পারে, তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। এক রাজা রামমোহন ব্যতীত আর সকলেই সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্গালায় ৭টি কারকের বিভক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। রাজা রামমোহনও বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুকরণে ৭টি বিভক্তি থাকিবে না কেন, তাহার সম্বন্ধে ভাল যুক্তি দেখান নাই। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা প্রমাণসহ হইবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, পাঠক উপন্যাসের মত উহা পড়িয়া যাইবেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম সংস্কৃতের অনুসরণ করিবে, না কথাভাষার মত পৃথক্ পথে চলিবে, ইহা লইয়া বহু দিন হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, এখনও চলিতেছে; কিন্তু আচার্য্য ১৩০৮ সালে এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যিকই সে পথের পথিক হইতে পারেন নাই। হইলে, বোধ করি বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিত।

'পরিভাষা' নাম শুনিলেই পাঠকের মনে একটা আতঙ্ক জন্মে, বুঝি কোষগ্রন্থের মত একটা শুধু শব্দ-তালিকা পড়িতে হইবে; কিন্তু আচার্য্য

রামেন্দ্রসুন্দরের সোণার লেখনী এমন নীরস বিষয়কেও সরস করিয়া তুলিয়াছে। পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে তিনি যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই দুর্লভ। তাঁহার আশা ছিল, বাঙ্গালা ভাষা যখন এত উন্নত হইয়াছে, তখন শীঘ্রই বাঙ্গালায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক্ গ্রন্থ লিখিতে হইবে। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে গিয়া যখন দেখিবে, অভিধানগুলিতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নাই, তখন তাহারা বাঙ্গালা ভাষাকে গালি পাড়িবে। তিনি এই ভয়ে ১৩০১—১৩০৬ সালের মধ্যে ৪টি পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু হায়, আচার্য্যের সে আশা এত দিনেও সফল হইল না।

———
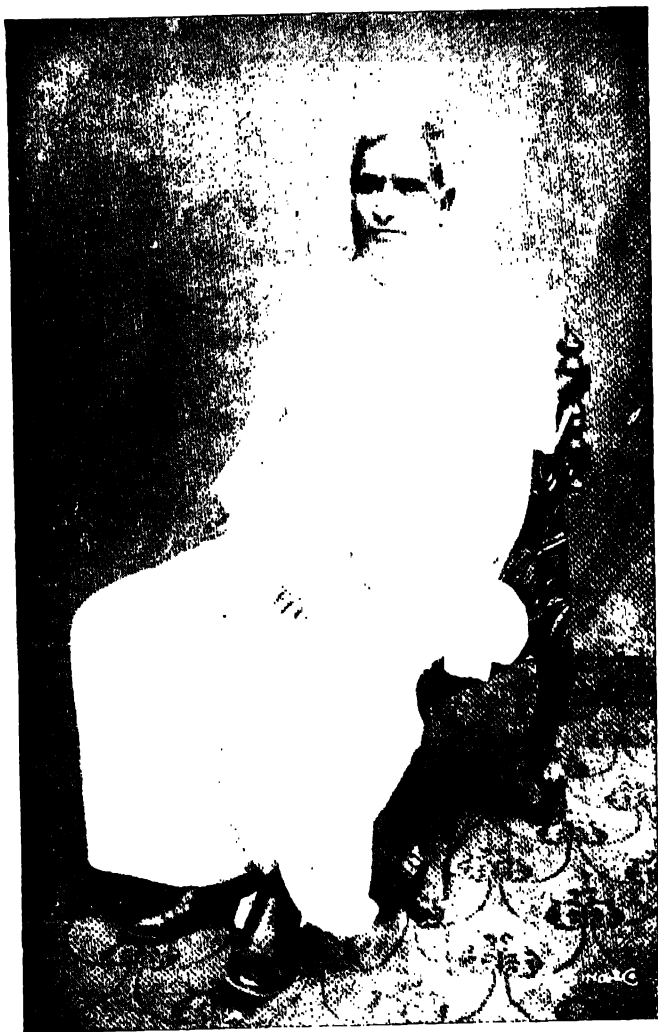
৺রামেন্দ্রসুন্দর (বার্দ্ধক্যে)

রামেন্দ্র-কথা

পরিচয়

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন অমিত বলশালী পুণ্ডরীকবংশোদ্ভব সবিতা রায় পুত্রপৌত্রাদি লইয়া তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহেই তিনি ফতেসিংহের জমীদারী প্রাপ্ত হন।

দীক্ষিত-উপাধিধারী সবিতা রায় জিঝোতিয়া শাখান্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পুণ্ডরীক-বংশের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কনোজিয়া ও ভূমিহার প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণগণ ফতেসিংহে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে কান্দী মহকুমা। ইহার পূর্ব্ব সীমায় ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্দ্ধমান জেলা ও পশ্চিমে বীরভূম অবস্থিত। এই কান্দী মহকুমার মধ্যে কান্দী ও ভরতপুর থানার প্রায় সমুদয় অংশ এবং বড়োঁয়া, গোকর্ণ ও খরগ্রাম থানার কতকাংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুল-গোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ মনোহররাম ত্রিবেদীর পুত্র হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ত্রিবেদী-বংশের এই মনোহররাম ও তৎপুত্র হৃদয়রাম প্রথমে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। হৃদয়রামের পুত্র দয়ারাম; দয়ারামের চারি পুত্র,—গদাধর, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। গদাধর নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বলভদ্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই বলভদ্রের সহিত জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ী দেবীর বিবাহ হয়।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কন্যা দয়াময়ী

ব্যতীত কালীনারায়ণ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। জেমোর বর্ত্তমান রাজারাই কালীনারায়ণের বংশধর।

বলভদ্রের কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও ভুবনসুন্দর নামে তিন পুত্র ও তিনকড়ি নামে এক কন্যা হয়। বলভদ্রের মধ্যম পুত্র ব্রজসুন্দর নিজে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন। তিনি 'মাধবসুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক, 'স্বর্ণসিন্দূর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামক একখানি প্রহসন বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণসুন্দরের, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর নামে দুই পুত্র হয়। ১২৫৫ সালে গোবিন্দসুন্দর ও ১২৫৮ সালে উপেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। এই গোবিন্দসুন্দরই রামেন্দ্র-সুন্দরের পিতা।

রাধিকাসুন্দর ত্রিবেদীর কন্যা চন্দ্রকামিনী দেবীর সহিত গোবিন্দ-সুন্দরের বিবাহ হয়। গোবিন্দসুন্দরের রামেন্দ্রসুন্দর ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র এবং চারিটি কন্যা হয়।

১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় রামেন্দ্রবাবু অপেক্ষা বয়সে দশ বৎসরের ছোট।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণের পৌত্র রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ী দেবীর পৌত্রদ্বয় গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তিছটায় জেমো-কান্দী উদ্ভাসিত। এই তিন পুণ্যশ্লোক মহাত্মার আদর্শে রামেন্দ্রসুন্দরের আদর্শ জীবন গঠিত হইয়াছিল। আভিজাত্যের এই অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিবার পূর্ব্বে এই তিন জনের একটু পরিচয় দিব।

গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরের পিতামহী দয়াময়ী দেবী এবং রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পিতামহ কালীনারায়ণ উভয়ে ভাই-বোন ছিলেন।

এই হিসাবে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরের ভ্রাতৃসম্পর্ক। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের অপেক্ষা বয়সে গোবিন্দসুন্দর আট বৎসরের ও উপেন্দ্রসুন্দর এগার বৎসরের ছোট ছিলেন।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তিনি কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এমন কি, ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষদিগের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। অপর দিকে তিনি আবার বিনয় ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে একাধারে কোমলতা ও কঠোরতার যে অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাই, তাহা অনুকরণযোগ্য। সকলপ্রকার সমাজহিতকর কার্য্যেই তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তাঁহার বিচারশক্তি ও বিবাদনিষ্পত্তি-ক্ষমতার উপর স্থানীয় ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের এরূপ অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, কেহ কখনও আদালতের দ্বারস্থ হইত না।

রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর নিজে একজন সাহিত্য-রস-পিপাসু লোক ছিলেন। তিনি "বঙ্গবালা" নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেই উপন্যাসের ভূমিকাটি পয়ারে রচনা করেন। উহা পাঠ করিলে তাঁহার দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন দোষ সহজে তাঁহার চোখে পড়িত না। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা, কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাঁহা হইতে বহু দূরে থাকিত।" (পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা) সকল সদনুষ্ঠানেই তিনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রধান সহায় ছিলেন। অসামান্য নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা প্রভাবে তিনি সকলের কাছে আদরণীয় ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দরও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; সংস্কৃত শ্লোক রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি কোমলকান্ত পদবিন্যাস দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার বালসুলভ সরলতা ও কোমলতা অনন্যদুর্লভ ছিল।

পিতা ও পিতৃব্যদ্বয়ের আদর্শ চরিত্র, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, পরোপকার-স্পৃহা, বালসুলভ সরলতা ও সাহিত্যানুরাগ পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরে বর্ত্তিয়াছিল। উত্তরাধিকারিসূত্রে রামেন্দ্রসুন্দর এই গুণাবলীর অধিকারী হইয়া ভবিষ্যতে নিজের যত্ন, অধ্যবসায় ও সাধনার ফলে সাহিত্য-সাধন-মার্গের যে উন্নত স্তরে উঠিয়াছিলেন, তাহার নূতন পরিচয় বোধ করি, দিতে হইবে না। সাধক রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গবাণীর সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সেই ব্রত পালনপূর্ব্বক বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী, বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল ও আপনাকে ধন্য করিয়াছেন।

ছয় বৎসর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দর গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। পিতৃদত্ত সুশিক্ষাগুণে প্রতি বৎসরই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই শিক্ষার ফলেই তিনি বাল্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে অনুরাগী হইয়া পড়েন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি নিজ জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি কান্দীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে রামেন্দ্রবাবু বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে ১২৮৮ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই আকস্মিক বিপৎপাতে অভিভূত হইয়াও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। এই সময় তাঁহার বয়স আঠার বৎসর।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার চারি বৎসর পূর্ব্বে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভসম্ভূতা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীর সহিত রামেন্দ্রবাবুর বিবাহ হয়। তখন রামেন্দ্রবাবুর বয়স চৌদ্দ ও তাঁহার পরিণীতা পত্নীর বয়স সাত বৎসর।

খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দরের সহিত কলিকাতায় আসিয়া রামেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পাঠ্য পুস্তকে তাদৃশ মনোযোগী না হইয়া, ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। ইহার ফলে তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক লাভ করেন। এই সময়ে আর একটি শোকাবহ ঘটনায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। ১২৯১ সালের ৬ই কার্ত্তিক তাঁহার পূজনীয় পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর পরলোকে গমন করেন।

রামেন্দ্রবাবু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর, জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, প্যারীলাল হালদার, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালিদাস মল্লিক ও হুইলার সাহেবের বন্ধুত্ব হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঁহারা সকলেই রামেন্দ্রবাবুর সহপাঠী ছিলেন।

বি-এ পরীক্ষাতেও রামেন্দ্রবাবু যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারেন নাই। এই সময়েই তাঁহার বিজ্ঞান পাঠে আসক্তি জন্মে এবং সেই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ বন্ধ করিতে হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চল্লিশ টাকা বৃত্তি পান। এই সময়েই "নবজীবন" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ইহার পরের ঘটনা রামেন্দ্রবাবুর নিজ-লিখিত আত্ম-কাহিনী (বঙ্গ-

ভাষার লেখক, ৮০২ পৃষ্ঠা) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে এম্ এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেড্লার সাহেব একটি 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—'আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ঐ 'out and out the best.' কিঞ্চিৎ থামিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলেন—'out and out the best.' তাঁহার ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি।"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে (Natural & Physical Science) প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একখানি স্বর্ণ-পদক ও এক শত টাকার পুস্তক পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এই পরীক্ষায় যে পাঁচ জন ছাত্র তাঁহার পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করেন, তাঁহাদের নাম ক্রমানুযায়ী নিম্নে প্রদান করিলাম;—

দ্বিতীয় স্থান—প্যারীলাল হালদার

তৃতীয় স্থান—সুরেশচন্দ্র সিংহ

চতুর্থ স্থান—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী

পঞ্চম স্থান—কালিদাস মল্লিক

এই বৎসরেই সংস্কৃত কলেজ হইতে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এম্ এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইহার পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রবাবু প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। অবিনাশচন্দ্র বসু (এক্ষণে রায় বাহাদুর) মহাশয়ও এই বৎসরে রামেন্দ্রবাবুর সহিত একত্রে ঐ বৃত্তি পান। এই

পরীক্ষায় রামেন্দ্রবাবুর লিখিত কাগজ দেখিয়া পরীক্ষকেরা নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন ;—

"The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination.—অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"—(বঙ্গভাষার লেখক, ৮০২ পৃঃ)।

ইহার পরে দুই বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার জন্য পেড্লার সাহেবের কাছ হইতে অনুমতি পান। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও তিনি বিদ্যা চর্চ্চা করিতে কোন দিন বিরত হন নাই। চিরজীবন জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তিনি অধ্যয়ন করিতেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্সের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পর বৎসরে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। এ সময়ে রামেন্দ্রবাবুর বয়স ২৭ বৎসর। পিতা ও পিতৃকল্প যে দুই জন পরমাত্মীয়ের স্নেহ, যত্ন ও আদরে তিনি লালিত, যাঁহাদের উচ্চ আদর্শে তাঁহার আদর্শ জীবন গঠিত, তাঁহারা একে একে চলিয়া গেলেন—রহিলেন কেবল স্বামি-শোকাতুরা রামেন্দ্র বাবুর পূজনীয়া বিধবা জননী।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভটাচার্য্য মহাশয় অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ করিলে, তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় সতের বৎসর কাল এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিনেট সম্পর্কে তিনি বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতা ও পরিচালনা-গুণে রিপণ কলেজ

উন্নতির শীর্ষ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় ইতিপূর্ব্বে অন্য লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর দুই কন্যা ও এক পুত্র হয়। পুত্রটি তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান, শৈশবেই এক বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়।

কান্দী বাগ্‌ডাঙ্গানিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রগোপাল রায় মহাশয়ের সহিত রামেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবীর এবং যশোহরের অন্তর্গত সামটানিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবীর বিবাহ হয়। দুই কন্যা ও তাহাদের পুত্রকন্যাগুলিকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাহারা তাহাদের আদরের 'বাবু-দাদার' কাছে প্রায়ই থাকিত, তিনি তাহাদের চোখের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না।

১৩১৮ বা ১৩১৯ সালে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ ৺পুরীধামে গমন করেন। সেইখানে তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হয়। ১৫ দিন মাত্র থাকিয়া সেখান হইতে ফিরিতে বাধ্য হন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি ফিক্ বেদনায় (Colic pain) আক্রান্ত হন।

এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি কিছু দিন ভাগীরথীর উপরে নৌকায় অবস্থান করেন। কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না।

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে তিনি ব্রাইট পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঐ সালের ২২শে পৌষ তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হয়। এই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। ১৩২৫ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন জেমোর ভবনে তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন ; এই সময়ে রামেন্দ্রবাবুর শরীর খুবই খারাপ। তিনি তখন কলিকাতায়, বহু লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃদেবীর

শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদনের জন্য জেমোয় গমন করিলেন। নানা প্রকার অনিয়ম, উপবাস ও পথকষ্টে রামেন্দ্রবাবুর পীড়া প্রবলাকার ধারণ করিল। শ্রাদ্ধাদি সমাপন হইয়া যাইবার পর ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু ফল বড় কিছু হইল না; রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

এই সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি বর্জ্জন করিয়া যে ইংরাজী পত্র লেখেন, রামেন্দ্রবাবু তাহা পাঠ করিয়া ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (মৃত্যুর ছয় দিন পূর্ব্বে) তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বাবুকে রবীন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি রবীন্দ্রবাবুকে রামেন্দ্রবাবুর শেষ দর্শন-প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। পরদিন সোমবার রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলে, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাকে উপাধিত্যাগের মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কবির নিজের কণ্ঠে নিজের লিখিত রচনা শ্রবণ করিয়া, সেই দিনই রামেন্দ্রের শ্রবণশক্তি লুপ্ত হইল। রবীন্দ্র-নাথের প্রস্থানের পর রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহার এই তন্দ্রা আর কাটে নাই—ইহাই শেষে মহানিদ্রায় পরিণত হয়।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দরকে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। তাঁহার পরলোকগমনের পূর্ব্বে পরিষৎ তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রামেন্দ্রবাবুর জ্ঞানলোপ হয়। ৫ দিন মাত্র এই অবস্থায় থাকিয়া গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় রাম-স্বভাব রামেন্দ্রসুন্দর পত্নী, ভ্রাতা, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকের পথে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

সাহিত্য-সাধনা

২৩ বৎসর বয়সে রামেন্দ্রবাবু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্ এ পড়িতেছিলেন, সেই সময় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দেন। প্রবন্ধটিতে তিনি নাম দেন নাই। 'নবজীবনের' চতুর্থ বর্ষের (১২৯৪ শ্রাবণ—১২৯৫ আষাঢ়) লেখকগণের নামের মধ্যে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে; কিন্তু প্রবন্ধের নীচে বা সূচীপত্রে লেখকগণের নামের উল্লেখ না থাকায় কোন্ প্রবন্ধটি রামেন্দ্রবাবুর, তাহা বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। তবে ইহা স্থির যে, এই চতুর্থ বৎসরের নবজীবনেই রামেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়। রামেন্দ্রবাবুর ভাষায় নিম্নে এই প্রবন্ধ-প্রকাশের বিবরণ দিতেছি—"বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষয়বাবু যেরূপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস খুব প্রবল ছিল। অক্ষয়বাবু সেই উচ্ছ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া ছাপিয়াছিলেন। তথাপি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি 'নবজীব'নে আরও অনেক প্রবন্ধাদি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষয়-বাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি।"

ইহার পর ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে কলিকাতার ঠাকুর-বাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইল। ১ম বর্ষের ২য় ভাগে রামেন্দ্রবাবুর 'আকাশ-তরঙ্গ' নামে এক বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার পর তিনি ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধাবলী 'সাধনা'য় বাহির করিতে লাগিলেন। এই সময়ে 'ফটোগ্রাফি' নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বাহির হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তৎপরে ১৩০১ সালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের 'আনি বেসাণ্ট', "একটি পুরাতন বিষয়","বৈজ্ঞানিক সংবাদ", 'প্রাকৃত সৃষ্টি', 'হর্ম্মান্ হেলম্-হোলট্‌' প্রবন্ধগুলি বাহির হয়। তিনি 'সাহিত্যে'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং এই পত্রিকাতেই তাঁহার শেষ-লিখিত যজ্ঞসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী বাহির হয়—তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়), 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'মুকুল', 'উপাসনা', 'মানসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্য হইতে কতক কতক সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে বহু রত্নের যে সমাবেশ হইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

১৩০৩ সালে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া 'প্রকৃতি' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব লিপি-কৌশলের গুণে এই দুরূহ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আজ পর্য্যন্ত ৩টি সংস্করণ হইয়াছে।

১৩০৬ সাল হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত এবং ১৩২৪ ও ১৩২৫ সালে তিনি পরিষদ্-পত্রিকা সম্পাদন করেন।

১৩০৭ সালে 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' নামে রামেন্দ্রসুন্দর

ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত ও বঙ্গদেশে উপনিবেশস্থাপনকারী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের কুলপঞ্জি প্রকাশ করেন।

১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া তিনি 'জিজ্ঞাসা' নামে পুস্তক বাহির করেন। এই জিজ্ঞাসারও ৩টি সংস্করণ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর উপক্রমণিকা-রূপে রামেন্দ্রবাবু 'মায়াপুরী' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ১৩১৭ সালে পুস্তিকাকারে সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার পর বৎসর, ১৩১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে 'ভারতশাস্ত্রপিটক' নামে বৈদিক গ্রন্থমালা-প্রকাশের সূত্রপাত হয় এবং রামেন্দ্রবাবুই উহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার প্রথম গ্রন্থ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ'। রামেন্দ্রবাবুই উহা ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

১৩২০ সালে তাঁহার 'চরিতকথা' ও 'কর্ম্মকথা' প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য মোক্ষমূলর প্রভৃতি মনীষিগণের জীবনকাহিনী রামেন্দ্রসুন্দর 'চরিতকথা'য় বিবৃত করিয়াছেন।

'কর্ম্মকথা'য় তিনি কর্ম্মের উপকারিতা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন কর্ম্ম ত্যাগ করা মানুষের সাধ্যাতীত এবং উহা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ের চেষ্টা ইহাতে আছে। Legality ও morality-র সমন্বয় করিবার জন্য একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৩২১ সালে রামেন্দ্রবাবুর কতকগুলি মৌখিক বক্তব্য লিখিয়া লইয়া "বিচিত্র প্রবন্ধ" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতীয় অনু-শীলনের ধারা (Cultural History) বিবৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ অনুশীলন আর হয় নাই।

১৩২৪ সালে তাঁহার 'শব্দ-কথা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহার 'যজ্ঞকথা' ও 'বিচিত্র জগৎ' নামে দুইখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। 'যজ্ঞকথা'য় 'অগ্ন্যাধ্যান ও অগ্নিহোত্র', 'ইষ্টি-যাগ ও পশুযাগ', 'সোমযাগ', 'ত্রীষ্টযাগ' 'পুরুষ-যজ্ঞ' এই পাঁচটী নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইয়াছিল। এবং এইগুলিই তাঁহার শেষ রচনা। তিনি গত ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় যে সমস্ত দার্শনিক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া-ছিলেন, সেগুলি 'বিচিত্র জগৎ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া 'ভূগোল' ও 'বিজ্ঞানপাঠ' নামে দুইখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক বাহির করেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-সাধনার ধারাবাহিক একটা বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়া আমা-দিগকে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াও যখন তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিল না, তখন তিনি দর্শনের আলোচনায় মনোযোগী হন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্যগুলিকে তিনি শাশ্বত সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি ব্যাবহারিক সত্য-গুলি ছাড়িয়া শাশ্বত সত্যের দিকে ছুটিলেন। ফলে পাইলাম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলনে শাশ্বত সত্যের পরিচয়। সমাজপতি মহা-শয়ের ভাষায় বলি,—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানব-চিন্তার এই ত্রি-ধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার পরিচয় দিলাম, এই সাহিত্যকে তিনি যে চক্ষে দেখিতেন, তাহার পরিচয় তাঁহারই কথায় দিতেছি—

"বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। × × × × বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমারা প্রাচীন বাঙ্গালার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই।" আমাদের এই বাঙ্গালা-সাহিত্য যাহাতে ভূবিদ্যা, অন্তরীক্ষবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার মৌলিক প্রবন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় এবং যাহাতে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল প্রথমে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষাকে গৌরবান্বিত করেন, তাহার জন্য রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিকদিগকে পুন পুনঃ অনুরোধ করেন; তাঁহার এ অনুরোধ বহু বৈজ্ঞানিক রক্ষাও করিয়াছিলেন।

শিক্ষাসংস্কারে রামেন্দ্রসুন্দর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে "স্যাড্‌লার কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিশনের সদস্যগণের নিকট রামেন্দ্রবাবু শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। উহা পাঠ করিলে, তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, কূটাগ্র-বুদ্ধি ও মহানুভব হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। আবহমান কাল প্রচলিত দেশীয় ভাবের শিক্ষানুষ্ঠানগুলি অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়া তিনি পুরাতন-প্রীতির যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উপভোগ করিবার জিনিষ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রামেন্দ্রসুন্দর আপাতমনোহর পাশ্চাত্যের মোহপাশ কাটাইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব ভাবধারার সম্মিলন দ্বারা ভগীরথের ন্যায় যে নব-গঙ্গা আনয়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা সকলের অবহিতভাবে প্রণিধান করা উচিত। কমিশনও কার্য্য-বিবরণীর

বহু স্থলে রামেন্দ্রসুন্দরের অকাট্য যুক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন।

এ কালের কালেজের, ও সে কালের টোলের অধীত বিদ্যা ও শিক্ষা-প্রণালীর তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়া রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কমিশন বলেন,—"রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী মন্তব্যে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার বিশ্লেষণ করা অসম্ভব, সকলকেই আমরা তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ত্রিবেদী মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার জীবনের সাফল্যের জন্য তিনি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তাহার ইউনিভারসিটীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী এ কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, সে কালের বিদ্যাশিক্ষার উপর তাঁহার যে বিশেষ স্পৃহা নাই, ইহা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এ কালের, ও সে কালের শিক্ষার পরিণতি ও অবস্থা তুলনা করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন। এখন পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি সে অচলা নিষ্ঠা নাই; গুরু শিষ্যের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না।" (Vol. I. P. 358) বাস্তবিকই তখন শিক্ষার্থী বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ করিত, আর এখন নাম, যশঃ ও অর্থের জন্য বিদ্যা অধীত হইয়া থাকে—কেবল মাত্র জ্ঞানার্জ্জন বর্ত্তমান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এখন ইহা গৌণ উদ্দেশ্যরূপে দাঁড়াইয়াছে, এবং অর্থকরী বিদ্যা হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য শিক্ষার প্রচলন ছিল, আর এখন শিক্ষা দ্বারা শক্তি-সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তাই শিক্ষার্থী শিক্ষার জন্য ব্যস্ত। পূর্ব্বে আত্মোন্নতির জন্য শিক্ষার প্রচার ছিল, এখন সমাজে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রচার।

রামেন্দ্রবাবু বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন যে, বিদ্যা বাজারের পণ্যদ্রব্য নহে, মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করা যায় না। ভারতবর্ষের তিন হাজার বৎসরের অতীত ইতিহাস এই পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রতিকূল সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকলেরই বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক। অধুনা শিক্ষালাভ করিতে হইলে যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা দুঃস্থ ভারতবাসীর পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

রামেন্দ্রবাবু সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্বন্ধ চুক্তিমূলক ছিল না। শিক্ষার্থীকে তখন অভিভাবকের সম্পূর্ণ ইচ্ছামত শিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে হইত না। শিক্ষার্থী তাহার নিজের ইচ্ছামত বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে গমন করিত; গুরুর পদপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার সহিত একত্রে আহার-বিহার করিয়া, তাঁহারি নিকটে যে সহানুভূতি পাইত, অধুনা তাহা একরূপ বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অপর এক স্থলে কমিশন বলিয়াছেন,—“রামেন্দ্রবাবুর মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিদেশী জিনিষ। বিদেশ হইতে আমদানী শিক্ষাবীজ ভারতের মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইয়াছে। তাঁহার মতে যে সমস্ত সামাজিক আচার-ব্যবহার, এই পুরাতন জাতির দৈনন্দিন জীবনকে গঠিত করিয়াছিল, সে সমস্ত আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া এই নূতন বিলাতী শিক্ষা আমাদের দেশে হঠাৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লোকে অভাবনীয় বিপদে পড়িয়া এই শিক্ষা চাহিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বৃত্তি, শক্তি ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানানুশীলনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পন্থা উদ্ভাবিত হওয়া উচিত। যদিও এখন সম্পূর্ণভাবে নূতন করিয়া শিক্ষাপ্রণালী গঠিত হওয়া সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও উপায়গুলি পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা-মূলক আলোচনা করা উচিত; এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর উপযোগী শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত।" (Vol. II. P. 621) মহামতি লর্ড রোণাল্ডশে গত উপাধি-বিতরণকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে রামেন্দ্রবাবুর মত তাঁহারি ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"The future of India depends upon finding a civilisation which will be a happy union of Hindu, Islamic and European civilisations." অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অনুশীলনধারার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা-ধারার সম্মিলনের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে।

অন্য এক স্থলে কমিশন লিখিয়াছেন যে, রামেন্দ্রবাবুর মন্তব্যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর একটি সুন্দর চিত্র আছে। তিনি বলিয়াছেন, যাঁহারা এই বিদেশী শিক্ষা এদেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন তাড়া-তাড়িতে শিক্ষার একটা যন্ত্র খাড়া করিয়াছিলেন; সে যন্ত্র জাতির আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনের সহিত কতটা সামঞ্জস্য হইল, সে বিষয় অনুধাবন করিবার তখন তাঁহাদের অবসর ছিল না। যাহা হউক, এ যন্ত্র শিক্ষাবিস্তারে যে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে—সরকার বাহাদুরের জন্য ইহা অনেক উপযুক্ত কর্ম্মচারী গড়িয়া দিয়াছে। ইহা আর একটু উপকার করিয়াছে—ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল, ভারতবাসীর জীবনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সে সঙ্কীর্ণতা এখন আর ততটা নাই। পাশ্চাত্য ভাব ও সভ্যতা আমাদিগকে দূরদর্শী করিয়া দিয়াছে। নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন আশাকে, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত

করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে—জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে এখন এমন এক উদার মনুষ্যত্বের পরিকল্পনা দেখা দিয়াছে, যাহা জাতীয় সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সময়ে সমস্ত জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে।

রামেন্দ্রবাবুর বর্ণিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতিত্বে আমরা মুগ্ধ এবং ইহার ভবিষ্য সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আশা করি, আমরা সংস্কারের জন্য যে সমস্ত পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, তাঁহারি উদ্ভাবিত আদর্শ লাভ হইবে—এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় নূতন জীবনের সৃষ্টি ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবনিচয়ের মধুর সম্মিলন হইবে।”

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষের যে উন্নতি হইয়াছে, ত্রিবেদী মহাশয় তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তিনি এ দেশের প্রাচীন রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা অনেক পাইয়াছি ; কিন্তু বিনিময়ে যাহা দিয়াছি, তাহার মূল্য বড় কম নহে ; এ পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের সনাতন অনুশীলন-ধারাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি,—আত্মসম্মানকে হারাইয়াছি—অপরের প্রতি ভক্তি সমূলে উৎপাটন করিয়াছি—জীবনের মহত্ব ও গৌরব ক্ষুন্ন করিয়াছি। রামেন্দ্রবাবুর জ্বালাময়ী ভাষায় বলি—“Western education has given us much ; we have been great gainers, but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.”

সাহিত্য-পরিষৎ ও রামেন্দ্রসুন্দর

১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ Bengal Academy of Literature নামক সভাকে পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে অভিহিত করা হয়। পরিষদ্-প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই রামেন্দ্রবাবু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। পরিষদের প্রথম বৎসরে তিনি কিছুদিনের জন্য সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদে যে যে বৎসরে তিনি যে যে পদে বৃত ছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৩০২—১৩০৫ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য

১৩০৬—১৩১০ পত্রিকা-সম্পাদক

১৩১১—১৩১৮ সম্পাদক

১৩১৯—১৩২১ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য

১৩২২—কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক, পরে সহকারী সভাপতি

১৩২৪—১৩২৫ পত্রিকাধ্যক্ষ

১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি মনোনীত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র ছয় দিবস তিনি উক্ত পদে বৃত ছিলেন।

১৩০৬ সালে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রাসাদ হইতে সাহিত্য-পরিষদ্ যখন ১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিল, সেই সময় হইতে সাহিত্য-পরিষদ্‌কে তাহার নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প রামেন্দ্রসুন্দরের হৃদয়ে বলবতী হয়। এই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার সহযোগী অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফীর অদম্য চেষ্টায়, কাশীমবাজারের বদান্যবর

মহারাজা স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ভূমিতে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ১৩০৭ সালের প্রারম্ভে উক্ত মহারাজের নিকট হইতে ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রামেন্দ্র-বাবুর ঐকান্তিক কামনা, প্রাণপণ পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের ফলে বাঙ্গালার যে সারস্বত নিকেতন—ভাষা-জননীর যে পবিত্র মন্দির নির্ম্মিত হইল, তাহা বঙ্গ-বাণীর পূজার্থীদিগের প্রাণের সামগ্রী। সাহিত্যের এক-নিষ্ঠ সাধক সুরেশচন্দ্রের ভাষায় বলি,——"বাঙ্গালীর উত্তর পুরুষ এই মহাতীর্থে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি ও কাম্যফল লাভ করিবে। আজ সাধনার তপোবনে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সাধকগণ যে অগ্নি-শরণের প্রতিষ্ঠা করিলেন, একদিন সেই পবিত্র সারস্বত-আশ্রমে ভারতের ভারতী আবির্ভূত হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী এই সারস্বত-মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন; সারস্বত-সাধনায় ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাব-কেন্দ্রে হোম-শালায় পরিণত হউক।" বিজ্ঞানের অন্যতম সাধক, জ্ঞানগরীয়ান্ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ——"এই পরিষদ্‌কে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথ-পার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্ত-র্দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদিগের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবন স্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র

আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উত্থানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।” সাধকের এই প্রাণের কামনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। একদিন আসিবে, যেদিন বাঙ্গালী কলিকাতায় আসিয়া পরিষদ্-মন্দির না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না।

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে রামেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় আর একটি কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি স্থায়ী তহবিল স্থাপিত হউক, এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই দিনেই উনিশ হাজার পাঁচশত টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এই ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

একমাত্র রামেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর পরিষদের বিবিধ ভাণ্ডারে সত্তর হাজার টাকার উপর দান করিয়াছেন।

১৩০১ সালে রামেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বহু মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়া ইহার শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণপ্রিয় সুবৃহৎ পুস্তকাগারটি যখন ঋণের দায়ে নিলামে উঠিবার উপক্রম হইল, তখন রামেন্দ্রবাবু দেখিলেন, মহাপুরুষের বহু যত্ন-সংগৃহীত ও সুরক্ষিত অক্ষয় কীর্ত্তি সাধারণ লোক-লোচনের আর গোচরীভূত হইবে না। তাই তিনি বদান্যবর রাজা বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে সেই অমূল্য রত্ন পরিষদে রক্ষা করিলেন। ১৩১৬ সালে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী পরিষদে স্থানান্তরিত হয়, এবং ১৩১৭ সালে পরিষদ্-মন্দিরে উহা স্থান পাইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বাঙ্গালীর অন্যতম অনুষ্ঠান

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে হয়। ১৩১২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ; অন্যত্র এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৯ সালে সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। সেই সময় হইতে ১৩১৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ফললাভে বঞ্চিত ছিল। ১৩২০ সালে শাস্ত্রী মহাশয় রামেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া—"রসকল্পদ্রুম" নামক সংগৃহীত অতি প্রাচীন পুথি পরিষদে রাখিবার জন্য অযাচিত ভাবে দান করেন। রামেন্দ্রবাবু উহা গ্রহণ করেন। এই দান ব্যাপার হইতে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়াছিলেন পরিষদের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের এখনও মমত্ব বোধ রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাহা দূর হইতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বলি,—"সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম, ঐ বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অনুরাগ ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলিতেছে। আমি সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই উড়াইয়া আগুন জ্বালাইতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; সেই আগুনের আলো এবং তৎসঙ্গে হয় ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষৎ এখন ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমিধ্ যোগাইয়া যজ্ঞের আগুনের মত ইহা রক্ষা করিতে পারেন, পরিষদের ভাগ্য।" রামেন্দ্রবাবুর আগ্রহে আবার আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে পাইয়াছি—আবার আমরা তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাধকের পরিণত জ্ঞানের ফললাভ করিয়া ধন্য হইতেছি।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (Museum) রামেন্দ্রবাবুর যত্নেই

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। কাশিমবাজার ও লালগোলার বদান্যবর নরপতিগণ ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিদিগের যত্ন, চেষ্টা ও দানে চিত্রশালা গৌরবশ্রীতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহায়তায় যাহাতে পরিষদে বিজ্ঞানের সার সত্যগুলির আলোচনা ও প্রচার হয়, তাহার জন্য মনোনিবেশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন বিজ্ঞানানুশীলনকে ছাড়িয়া দিলে ত চলিতে পারে না। এ কারণ ১৩১৬ সালে রামেন্দ্রবাবু পরিষদ-মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে উক্ত বক্তৃতার ভূমিকা স্বরূপ "মায়াপুরী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩২১ সালে পঞ্চাশৎ বর্ষ উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হইলে, তিনি কিছুতেই উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। পরিশেষে পরিষদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। এই আনন্দোৎসবে রবীন্দ্রনাথ মাধুর্য্যময়ী ভাষায় যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের কর্ণ-কুহরে যেন ধ্বনিত হইতেছে—সেই উদাত্ত স্বরোত্থিত "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি" বাণী আকাশে বাতাসে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রামেন্দ্রবাবু এই অভিবাদনের উত্তরে ভাবগদগদ কণ্ঠে, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে

সম্মান বা সম্বর্দ্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমার সেব্য-সেবক সম্পর্ক। এতকাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্য্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করেন তাহা আমি শ্লাঘা মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।" বাস্তবিক কথাগুলি তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক নহে,—প্রাণের কথা।

১৩২১ সালে যখন তাঁহাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যায়, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার এই চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি?"* তৎপরে বহু অনুরোধে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য পরিষদ্ যাহা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ যে চেষ্টা করেন, তাহার মূলে রামেন্দ্রবাবুর চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষদের পঞ্চদশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে চাই;—"সাহিত্য-পরিষদের জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় সে আবেদন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য যে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, তাহা স্বীকারে বিশ্ববিদ্যালয় তখন

* এই পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দরের স্বহস্ত-লিখিত এই কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে।

কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান বা পরীক্ষা-গ্রহণ প্রকৃষ্টভাবে চলিতে পারে, একথাও তখন অনেকের নিকট উপহাস্য হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে কেবল এইটুকু ফল হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছিলেন, ফার্ষ্ট আর্টস ও বি-এ পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। সম্প্রতি নব-সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য-পরিষদের তাৎকালিক প্রার্থনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মের ফলে মধ্য পরীক্ষায় ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য ও অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে, বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই উত্তর লিখিতে পারিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ্ আশা করেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সহিত এমন দিন আসিবে যে, উচ্চশিক্ষার বিষয়ীভূত যাবতীয় গ্রন্থ, যাহা এখন ইংরাজীতে অধীত ও অধ্যাপিত হয়, তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং পরীক্ষা-গ্রহণ সমস্তই আমাদের মাতৃ-ভাষাতেই সম্পাদিত হইবে।”

সুখের বিষয় বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ এম্-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালার স্থান হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের আশা কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার উদগ্র কামনা কার্য্যে পরিণত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরের বড় আদরের ও প্রাণের জিনিষ ছিল—সাহিত্য-পরিষদের সেবাই রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের ব্রত ছিল। শুধু আপনি সেবা করিয়া তিনি আনন্দের অধিকারী হইতে চান নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া সেই আনন্দ উপভোগ করিতে।

রামেন্দ্রসুন্দরের দেশাত্ম-বোধ

রামেন্দ্রসুন্দরের অনুষ্ঠিত লোকহিতকর কর্ম্মের কতকটা পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দিয়াছি; কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুধাবন করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, রামেন্দ্রসুন্দর সেই পুরাকালের ঋষির ন্যায় আত্মবলি দিয়া এগুলিকে সফলতার উচ্চশিখরে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এ গুলির প্রেরণা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহার অকৃত্রিম দেশানুরাগ—দেশাত্মবোধেই তাঁহাকে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর আর যাহা কিছু থাক্ আর না থাক্, আছে তাহার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাণী। তিনি মায়ের ডাকে বুঝিয়াছিলেন, সাহিত্যসেবীদিগকে একত্র করিয়া মায়ের বোধন বসাইতে হইবে—মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দল বাঁধার উপকারিতা—সঙ্ঘের আবশ্যকতা তিনি হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছিলেন,—বুঝিয়াছিলেন—সংহতিই কার্য্যসাধিকা। বাঙ্গালীর শক্তি যদি সম্মিলিত হইয়া একই খাতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সে ভাব-ধারা শাশ্বত হইবে। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—বাঙ্গালীর চিরন্তন ভাবধারাকে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই ভাবধারা জগতের চিন্তারাজ্যের পার্শ্বে আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইতে পারে। তাই কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ভারতীয় ভাব-ধারা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সেই ভাবধারা বুঝিবার জন্য পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া তিনি কোন দিন দাঁড়ান নাই—তিনি পরের ভাষায়—ইংরাজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই, করিয়াছেন সেই ভাষায়, যে ভাষায় তাঁহার প্রথম শব্দ স্ফুরিত হইয়াছিল—সেই অনবদ্য সুন্দর বঙ্গভাষার সাহায্যে তিনি ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই

ভাষা-প্রীতিও দেশাত্মবোধের অন্যতম পরিচায়ক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কয়েকবার বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি প্রতিবারই বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন না বলিয়া সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মহামতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর আগ্রহে ও যত্নে তিনি 'যজ্ঞ' সম্বন্ধে যে অমূল্য বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার যত্নে, তাঁহারই চেষ্টায় বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ন্যায্য আসন পাইবার অধিকারী হইয়াছে। এই বঙ্গভাষা-প্রীতির জন্যই তিনি কলেজে বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিতেন। সে সময়ে বাঙ্গালাভাষায় যে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায়, এ ধারণা অনেকেরই ছিল না। তৎকালীন দেশীয় অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের সহিত ইংরাজী ভাষা ভিন্ন মাতৃভাষার ব্যবহার করিতেন না। ইংরাজীভাষার প্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী ভক্তি ছিল. তাহার বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় একটা আভিজাত্য ছিল—রাজকীয় ভাষা বলিয়া তাহার প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিতেন। যাহা হউক, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এই ইংরাজী ভাষা-প্রীতির মোহপাশ সে যুগে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জটিল ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমাদিগের মনোগত ভাব ভালমতে বালকদিগকে বুঝান সুকঠিন। অপর ভাষার সাহায্যে দুরূহ-ভাবরাজির সহিত পরিচয় সহজে হইতে পারে না। জগতের কোন সভ্যদেশেই অপর ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয় না। কেবলমাত্র ভারতেই এ পন্থা প্রচলিত।

স্বদেশী যুগের সময় তাঁহার স্বদেশপ্রীতির পরিচয় আমরা সম্যক্‌-ভাবে পাইয়াছি। অরন্ধনের পরিকল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক-প্রসূত। রামেন্দ্রবাবু বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালার শক্তিরূপিণী মেয়েরা যদি এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান না হন, তাহা হইলে চঞ্চলমতি

বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইতে পারেন, তাই তাহাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীর মেয়েকে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' অপূর্ব্ব ভাষায় শুনাইয়াছিলেন। সে কথা এখন রাজপুরুষদিগের কৃপায় উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই।

হীরেন্দ্রবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে, রামেন্দ্রবাবুর হৃদয় স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা ছিল। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান না করিলেও, রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য চিন্তা করিতেন। দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। কি উপায় উদ্ভাবিত হইলে আবার তাঁহার স্বদেশ, জগতের সমক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। রাজনীতিতে তিনি জাতীয় দলের (Nationalist) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন ভারতের মঙ্গলকামী কর্ম্মী আনি বেসাণ্ট মহোদয়ার সভানেত্রী লইয়া ভারতসভায় বিতণ্ডা হইতেছিল, তখন রামেন্দ্রসুন্দর শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটা প্রশ্ন, স্বতঃই আমাদিগের মনে উদয় হয়, এই স্বদেশপ্রীতির বীজ কে তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত করিয়া দেয়? এ প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পূজ্যপাদ জনকই মেঘমন্দ্রস্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।

"সারস্বত-ভবন" পরিকল্পনায় রামেন্দ্রসুন্দর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে ১৩১৪ সালে বহরমপুরে রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃ-মন্দির ও মাতৃপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালী অর্ব্বাচীন জাতি নয়। প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্ত্তি-কাহিনী এখনও বক্ষে ধারণ করিয়া বহু দেশ ধন্য হইয়াছে। এখনও সুদূর বালী ও যবদ্বীপে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও বাঙ্গালী 'ঘরবোলা' হয় নাই,—বরভূধরের স্থাপত্য বাঙ্গালীর কলা-কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এমন দিন বাঙ্গালীর ছিল, যখন কেবল ভারতবর্ষে নহে, চীন ও তিব্বত দেশে বাঙ্গালীর জ্ঞানগরিমা বিস্তৃত হইয়াছিল। জানি না কাহার অভিশাপে এই এত বড় একটা জাতি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে। ভাব ও কার্য্য-প্রবণ রামেন্দ্রসুন্দর এই আত্মবিস্মৃত জাতির সুপ্ত আত্মবোধকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, কলা-ভবন-সৃষ্টি তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যেখানে বঙ্গের সাহিত্যিক কর্ম্মবীরগণের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইবে,—যেখানে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদানসমূহ সংগৃহীত হইয়া উত্তরকালের লেখক-গণের সাহায্য করিতে পারিবে। যেখানে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালী "বাঙ্গালার ফলফুল, লতাপাতা, গাছপালা, জীব-জন্তু শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইবে।" রামেন্দ্রবাবু এই মন্দিরকেই 'মাতৃমন্দির' ও মন্দির-মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে 'মাতৃপ্রতিমা' বলিয়া অভিহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পরবৎসর রাজসাহীর দ্বিতীয় অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থ-প্রকাশ করিবার জন্য রাজসাহীকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও গত বৎসরের ন্যায় বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা দেশের কোথায় কি আছে, ও কোথায় কি ছিল, বাঙ্গালী জাতির সম্পদ্ কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে চাই। এই জন্য আমাদের মনে

একটা আকাঙ্ক্ষা—একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে, আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান।" এই আত্ম-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বাঙ্গালা দেশকে জানিতে বলিয়াছেন। পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিশ্রুতকীর্ত্তি বাঙ্গালীজাতির জ্ঞান-গরিমার পরিচায়ক নিদর্শনগুলির একত্র সমাবেশ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

দুই বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার প্রাণের কথা জ্ঞাপন করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ১৩১৬ সালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কল্পিত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ইহাই সূত্রপাত, এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব চিত্রশালা-স্থাপন-চেষ্টার ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল যে, যাহা তিনি জাতির কল্যাণপ্রসূ বলিয়া বুঝিতেন, তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে কখন বিরত হইতেন না। তিনি পুনরায় ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে 'সারস্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া ঐ ভবন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ "রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবন" নামে অভিহিত হউক, এই প্রস্তাব করেন। বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দানশীল কাশিমবাজারাধিপতি প্রস্তাবিত "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণ জন্য সাত কাঠা জমি এবং বরোদার বিদ্যোৎসাহী মহারাজা বাহাদুর পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আরও অনেক মহাত্মা এই সদনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু যে বিপুল অর্থ এই ভবন নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন—তাহার এক

চতুর্থাংশও সংগ্রহ হয় নাই। রামেন্দ্রবাবু এই সম্পর্কে বাঙ্গালীর কাছে প্রার্থনা করিলেন,—"রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত-ভবন, বঙ্গের সারস্বত-ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশা ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী ভবন—সেই রমাভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্য, আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি।" বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আজিও রামেন্দ্র-পরিকল্পিত রমেশচন্দ্র-স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইল না।

প্রস্তাবিত 'রমেশ-ভবন' কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহার সভাপতি ও আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার প্রিয়শিষ্য দীঘাপতিয়ার সর্ব্বজনপ্রিয় কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাগলপুরে 'রমেশ-ভবন' প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরে, ঐ সালের এপ্রিল মাসে অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্যোগে ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রিয়শিষ্য কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের যত্ন ও পরিশ্রমে 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর পরিকল্পনা ও তাহার অভিব্যক্তির প্রভাবেই বঙ্গদেশের পুরাবৃত্তের উপকরণ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাচীনকীর্ত্তি-সমূহের পরিচয় জগতের নিকট প্রদান করিতেছে।

সাহিত্য-সম্মিলন ও রামেন্দ্রসুন্দর

১৩১৪ সাল বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর। এই সালে পরিষদের মন্দির-নির্ম্মাণের কার্য্য সমাপ্ত হয়, আর এই সালের ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার, কাশীমবাজারে দানশীল ও সাহিত্য-বান্ধব মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রধান উদ্যোগে ও কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনবার এই সম্মিলনের চেষ্টা করা হয়—সুকবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদে, রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের উদ্যোগে রঙ্গপুরে ও ১৩১৩ সালে সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় বরিশালে। কিন্তু সে সমস্ত আয়োজন নানা প্রতিবন্ধকতায় কার্য্যকরী হয় নাই। বহুদিন হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকদিগের মনে এইরূপ একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল—কিন্তু উপযুক্ত সময় ও কর্ম্মীর অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ বহু বাণী-সেবক-আকাঙ্ক্ষিত এই মিলনের অনুষ্ঠানকে কার্য্যকরী ও সফল করিবার জন্য যখন ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন, যখন পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও কর্ম্মবীর রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার উপযুক্ত সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর সহযোগে সম্মিলন-পরিচালনার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন, তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইল।

ভাষাজননীর সেবকবৃন্দের এই প্রীতি-সম্মিলনের উপযোগিতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর ইহার পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনি বুঝিলেন—বর্ত্তমান সময়ে আমরা রাজনীতিতে দল বাঁধিয়াছি, সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত কোমর বাঁধিতেছি,

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য ধর্ম্মমহামণ্ডল গড়িতেছি—এই দল বাঁধার যুগে সাহিত্য-সেবীদিগকেও দল বাঁধিতে হইবে। ভাবের বিনিময় ও আদানপ্রদানের জন্য, বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশস্থিত সাহিত্যসেবকদিগের পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করাইবার জন্য, দেশের ও দশের মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি সঞ্চারিত ও সাহিত্য-সেবক সৃষ্টি করিবার জন্য, এক কথায় সাহিত্যের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য এই মিলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই মিলনে আনন্দ আছে, লাভও আছে; সে আনন্দ ও লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। খুব একটা, বড় সুর তাঁহার প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল—যে ভাষার বাণী অবলম্বন করিয়া শৈশবে আমার কণ্ঠ হইতে প্রথম বাক্য স্ফূরিত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে আমার ও আমার জাতির পরিচয়,—সেই বঙ্গবাণীকে আমাদের চিনিতে হইবে। যেদিন আমরা সেই মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ ও সফলকাম হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি আমরা সেই চিনিবার উপায়ের বিধান করিতে পারি, তবেই আমাদের অনুষ্ঠিত এই সাহিত্য-সম্মিলন সার্থক হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের অনুকূল সকল প্রস্তাবই এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত হয়। যে পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি ও যাহার জন্য বাঙ্গালার জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা স্থাপিত হইতেছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনও সেই সমস্ত কার্য্য সাধনের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আহ্বান করিলেন। এই প্রথম বর্ষের সম্মিলনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলন ও জাতীয় কীর্ত্তিকলাপ রক্ষার জন্য একটি "সারস্বত-ভবন" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। ১৩১৩ সালের কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনীতে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে প্রাচীন পুথি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, পরলোক-গত সাহিত্যসেবীদিগের হস্তাক্ষর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যিক প্রদর্শনী খোলেন—তাহা হইতেই এই প্রস্তাবের উৎপত্তি। এই প্রদর্শনীর পূর্ব্বে ইহার পরিকল্পনা বাঙ্গালায় আর কোথাও, কাহারও মনে উদিত হয় নাই। সম্মিলনে ইহার প্রস্তাব ও আলোচনা হয়, এবং তাহারি ফলে বঙ্গবাসীর মনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া পরিষদের চিত্রশালা, রমেশ-ভবন, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, গৌহাটী-অনুসন্ধান-সমিতি, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি, রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের চিত্র-শালা প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

সেই ১৩১৪ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু কেহ কেহ এখন পরিষদের ক্রোড় হইতে এই সম্মিলনকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে বাঁকীপুরে সম্মিলনকে রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তৎলিখিত নিবেদনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করায় রামেন্দ্রবাবু বিশেষ ব্যথিত হন। একমাত্র সাহিত্য-পরিষদের ধাত্রীত্ব গুণে এবং রামেন্দ্র-ব্যোমকেশের প্রাণপাত পরিশ্রমে যে সম্মিলন আজ সফলতা লাভ করিয়াছে, যাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী কর্ম্মকুশলতায় দেশের সাহিত্য ও সাহিত্য-সমাজ উপকৃত, তাহাকে পরিষৎ হইতে স্বতন্ত্র করার সংবাদে রামেন্দ্রবাবু প্রাণে যে ব্যথা পাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যিনি সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে বৃত থাকিবেন, নিয়মানুসারে

তিনি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিরও সম্পাদক হইবেন। রামেন্দ্রবাবু প্রথম পাঁচ বৎসর কাল সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক ছিলেন।

চরিত্রানুশীলন

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা বিভিন্ন মনীষী কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। আমার কার্য্য সে গুলির একত্র সমাবেশ করা—রামেন্দ্রসুন্দরের চরিত্রের বিশেষত্ব দেখান।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন বাস্তবিকই মধুর ছিল—আনন্দ তাহার অপ্রতিহত প্রভাব তাঁহার উপর বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের শুচিতা, হৃদয়ের উদারতা ও সদাশয়তা উপভোগের সামগ্রী। পর-নিন্দা ও পরচর্চ্চায় কখন তাঁহাকে যোগ দিতে দেখা যায় নাই। তিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। হিংসা তাঁহার কাছে পৌঁছিতেই পারিত না। সাধারণকে লইয়া যাহাদিগকে কাজ করিতে হয়, তাঁহারাই জানেন, সাধারণের মনোরঞ্জন করা কত দুরূহ ব্যাপার। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা,—বিভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনিবার শক্তি তাঁহার মত কম লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মপ্রবণতা ও বৈরাগ্য-প্রবণতা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাব একাধারে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে মধুময় করিয়াছিল। একদিকে তিনি যেরূপ কর্ম্মী অপরদিকে তেমনি ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন ত্যাগেই শান্তি। তিনি স্বার্থত্যাগী ছিলেন বলিয়া, পরিষদের জন্য সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বার্থত্যাগের—আত্মসমর্পণের এরূপ কনকোজ্জ্বল মহিমা জগতের ইতিহাসে বিরল। আর এই জন্যই তিনি কোনদিন

যশঃ, মান ও উপাধির প্রত্যাশী ছিলেন না। অহঙ্কার ও অভিমান তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত।

সৃজন করিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। বহু দেশহিতকর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা যে তাঁহার, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর মানুষকে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার প্রেম বিশ্বজনীন ছিল। এই প্রেমধারা তাঁহার বন্ধুদিগের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধুবৎসল করিয়া তুলিয়াছিল—এই প্রেমধারাই তাঁহার সহকর্ম্মীদের আপনার করিয়া লইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের কথাটা সহমর্ম্মী ছিলেন। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর স্মৃতি-বাসরে রামেন্দ্রসুন্দর যে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই সহমর্ম্মীতা-সঞ্জাত।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর যে আপনিই আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেন, তাহা নহে—অপরকে কার্য্য করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন এবং প্রেরণা দিতেন। তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি ও প্রণালী অভিনব ছিল; বিরক্তির সহিত তিনি কখনও কোনদিন কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি যে কেবল সাহিত্যের আলোচনা করিতেন তাহা নহে, নূতন সাহিত্য-সেবক সৃষ্টি করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য ছিল। তাঁহার যত্নে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাই। তাঁহার "অভয়ের কথা" ও "ঠাকুরাণীর কথা" বঙ্গবাসীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার নিকট সাহিত্য-সাধনায় দীক্ষিত হইয়া অনেক সাহিত্যসেবক আজ যশস্বী হইয়াছেন। সাহিত্য-সেবকদিগকে সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে তিনি কোনদিনই কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আবশ্যক মত কঠোর ও কোমল ভাব ধারণ করিয়া তিনি ছাত্রদিগকে মানুষ করিতেন।

মানুষের দল বাঁধিবার যে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি 'সাহিত্য-সম্মিলন' ও রিপণ কলেজে 'অধ্যাপক-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

নিয়ম ও যন্ত্রের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের কোনদিনই শ্রদ্ধা ছিল না; তিনি বুঝিয়াছিলেন যন্ত্র যন্ত্র মাত্রই যেখানে কার্য্য করিবার জন্য প্রাণের টানের আবশ্যক, সেখানে যন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না। কার্য্যের জন্য বুকের রক্ত দিতে হয়। এই কথা তিনি ৺ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতিবাসরে ভাবপ্লুত হইয়া বলিয়াছিলেন;—আর এইজন্যই তিনি রিপণ কলেজে অধ্যাপক-সঙ্ঘ-পরিচালন কার্য্যে কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেন নাই।

তাঁহার দেশাত্ম-বোধের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধির সহিত বেদ-বেদান্ত অলোচনা দ্বারা, তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলে সনাতন সত্যগুলিকে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ্য ভারতের ভাবধারা অন্যান্য সভ্যজাতির ভাবধারার উপরে সগর্ব্বে দাঁড়াইতে পারে। আদর্শ ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব—নির্ভীকতা ও সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রে দেদীপ্যমান ছিল।

উপসংহারে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণের কামনা ও ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। প্রার্থনা করি, প্রত্যেক বাঙ্গালী ইহা পাঠ করিয়া পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। এই সেবা দ্বারা রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোকগত আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।—সমগ্র দেশ আপনাদের যশোগানে মুখরিত হইবে, আপনাদের অস্তিত্বে দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর বাঙ্গালার ভবিষ্য বংশধরেরা আপনাদের এই মহৎ আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়া দেশের সাহিত্য-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবেন;—

"সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলন-কেন্দ্র-স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ-নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষৎ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধার-সাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।"

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-সম্মিলন

লেখক—৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কেরোসিনের প্রদীপ জালিলে তাহার চিমনির ভিতর হাওয়া জন্মে ; আপন-ঘরে আগুন দিয়া গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইলে ছোট-খাট একটা ঝটিকার উৎপত্তি হয় ; কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক জটলা করিয়া দেশ-ব্যাপী সাইক্লোন উৎপাদন করিতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া যে একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অতি বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; এবং এই হাওয়া যে, কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই, তাহাও বলা বাহুল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুৎকার-প্রয়োগে পটু, কিন্তু সাত কোটি বাঙ্গালী এক সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গালা দেশে এমন একটা ঝটিকাবর্ত্তের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা বহিতেছে তাহা স্বীকার্য্য ; প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে আমরা ভারতসচিব সাধু মর্লির বক্তৃতা হইতে কোটেসন তুলিয়া মানাইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি। এই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া বাঙ্গালার যত নগণ্য ধূলিকণা, বাঙ্গালার যেখানে যত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বিদ্যমান আছে,তা ছাড়া এখানে ওখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হইতেছে ও স্থানে অস্থানে স্তূপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল-বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল-বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের

বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেসে, কন্‌ফারেন্সে, জেলাসমিতিতে, পল্লীসমিতিতে দল পাকাইতেছেন; যাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহারা সামাজিক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্ম্মমহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চান, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন? সকলেই যদি হাওয়ার অনুকূলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডলিকা-প্রবাহের মত পরের অনুকরণজাত বলিয়া উপহাস করিতে চান, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সাত কোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দিয়া কখনই ইহা জন্মাইতে পারিত না।

আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানা স্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ লোকশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিল্পশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অন্ন বাহিরে না যায়, তাহার জন্য প্রাচীর গাঁথিবার কল্পনা করিতেছেন, কেহ সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ঘোঁট করিতেছেন, কেহ দল বাঁধিয়া সরকারের উপর গোসা করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা হাতের কাছে

কর্ম্ম না পাইয়া স্বরাজ-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড় পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাব-পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভবের হাটে বেচা-কেনা লেনা-দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধূঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন-কার্য্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য এই পরিশ্রম-স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেন না, এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।

আমরা এই পাখীর দল যে আজ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া, এই ছায়ামণ্ডপতলে ঘটা করিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছি, আমাদের এই সভাভঙ্গ হইলে তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে আবার ত উড়িতে হইবে, আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে উড়িব? দেশের যে হাওয়া বহিয়াছে, সেই হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই সুবিধা এবং সেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। কেবল দেখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে? উহা সুপথে, না বিপথে? উহার টান একটা আশ্রয়ের দিকে, না কোন অকূল পাথারে আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, উহা আমাদের বিহঙ্গ-জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে?

সকল দেশেই এক এক সময়ে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝড় বহে। কোন দেশেই অন্তরীক্ষ চিরকাল প্রশান্ত থাকে না; চির-বসন্ত কোন দেশেই বিরাজ করে না। বৎসরে যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, মানব-সমাজের ইতিহাসে তেমনি যুগের পরিবর্ত্তন ঘটে; এক এক যুগের হাওয়া এক এক দিকে। যুগের যাহা লক্ষণ, যাহাকে যুগধর্ম্ম বলা যায়; হাওয়ার গতি দেখিয়া তাহার নিরূপণ হয়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশেও কত বার এইরূপ হাওয়া বহিয়াছে; কত বার কত যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া দেশের লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। ভাবের পাথারে তখন তরঙ্গ উঠিয়াছে; কখনও বা পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাৎকালিক সাহিত্যিকেরা সেই হাওয়াতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; সেই তরঙ্গ ঠেলিয়া পাথারের মধ্যে তাঁহারা সাঁতার খেলিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে এক-মাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য-স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সদাগরের ডিঙায় চাপিয়া সিংহল-যাত্রার সময়ে যাঁহারা সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী তুলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপন্ন

করিতে পারি ; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার পূর্ব্বে আপন পিতৃব্যের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই প্রমাণে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি ; তথাপি আমার সংশয় আছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্যবৃত্তির বা বীরবৃত্তির উদাহরণ বড়বাজারে অধিক মূল্যে বিকাইবে না। জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তি-কথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না।

নাই বা হইলাম ! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব ; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে ? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।

সে আজ দেড় হাজার বৎসরের কথা, যখন চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়াং সুহ্মরাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে জাহাজে চড়িয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তখন জন্মগ্রহণ করে নাই; তখনকার বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিব কি না, তাহা জানি না। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পুণ্ড্র, চণ্ডাল ও কৈবর্ত্ত তখন বোধ করি, বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া অবস্থিত ছিল। অনার্য্যের অধিবাস বঙ্গভূমিতে আর্য্যের উপনিবেশ তাহার বহু পূর্ব্বে কোন্ পৌরাণিক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় কঠিন; রামায়ণে ও মহাভারতে, এমন কি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে, তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। নরকাসুরের বংশধর কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অক্ষৌহিণী চালনা করিয়াছিলেন; পৌণ্ড্রক বাসুদেব, যদুপতি বাসুদেবের স্পর্দ্ধা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহমধ্যে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ছিল কি না, জানিবার কোন উপায় নাই। তবে আর্য্য-সভ্যতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে কোন্ পুরাতন কালের কথা, আমি যে কালের কথা বলিতেছি, তাহা সে কালের তুলনায় এ কাল। এই এ কালেই বা বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? ভাগীরথী তখনও শতশাখা বিস্তার করিয়া শতমুখে সাগর-সঙ্গমে চলিতেন; গঙ্গাস্রোতের অন্তর মধ্যে দিগ্বিজয়ী রাজারা যে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়া যাইতেন, পরবৎসরের গঙ্গাস্রোতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইত। সোনার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের চারা এখনকার মতই উৎখাত হইয়া প্রতিরোপিত হইত ও হেমন্তাগমে কৃষকপত্নী রাত্রি জাগিয়া সোনার ফসল রক্ষা করিত, উজ্জয়িনীর মহাকবি তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সে কালের রাজধানীতে ও নগরমধ্যে নাগরিকেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমারচরিতের

বর্ণনার সহিত এ কালের নাগরিক-চরিত মিলাইলে বাঙ্গলাদেশে মানব-চরিত্রের এই দেড় হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণ্ড্রারাজ্য ফাহিয়াংএর সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও দুই শত বৎসর পরে যখন হুয়েংচ্যাং বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের সেই দুই রাজ্য সমৃদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। হুয়েংচ্যাংএর পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই পশ্চিমবঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, গুপ্ত-রাজাদের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষী। গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরও তাহার এক ভগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতেছিল, হুয়েংচ্যাং স্বয়ং তাহার সাক্ষী। এই সভাস্থলের ক্রোশ দুই তিন ব্যবধানমধ্যে ভাগীথীর পশ্চিম কূলে রাঙ্গামাটির রক্তমৃত্তিকামধ্যে হুয়েংচ্যাং-বর্ণিত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ হয় ত নিহিত রহিয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তখন আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তিপদে আসীন আছেন; গৌড়েশ্বর গুপ্তরাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যাসাধন করিয়া, সেই চক্রবর্ত্তী রাজার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার প্রবর্ত্তক ছিলেন; তাঁহাদের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই, বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গের রাজসভায় আহূত হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইতেছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজের ভিত্তিপত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

তার পরেই পাল-রাজাদের অভ্যুদয়। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই একটা নূতন যুগ। তখন দেশ জুড়িয়া একটা নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন তখন ভাঙ্গিতেছে, উহার ভগ্নাবশেষের আবর্জ্জনা সেই যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই

জঞ্জালের মধ্য হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া নূতনের গঠন চলিতেছে। এই যুগটা বস্তুতই অতি আজগুবি যুগ—চারি দিকেই তখন অদ্ভুত রসের বাহুল্য। পাল রাজারা সৌগত শাসন মানিতেন; ব্রাহ্মণ্য তাঁহাদের সময়ে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিতেছে না। তখন ব্রাহ্মণের সহিত বৌদ্ধ-পন্থার দ্বন্দ্ব চলিতেছে; দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা আছে; উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া ও উভয়কে বিকৃত করিয়া তান্ত্রিকতা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। নাথ যোগী-দের চেলারা তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। যোগীরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা মাটিতে পা ফেলিয়া চলেন না; তাঁহারা গাছে চড়িয়া আকাশ-পথে দেশভ্রমণ করেন। বড় বড় বটের গাছ ও তালের গাছ তাঁহাদের এয়ার-শিপের কাজ করে। তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিবামাত্র মানুষ অবলীলাক্রমে ভেড়া বনিয়া যায়। তখন হাড়ি গুরুর আদেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্ম্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করিয়া চলেন। চণ্ডীদেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির করিয়া পূজা লইবার জন্য ব্যস্ত; চ্যাং মুড়ী বিষহরী, চাঁদ সদাগরের সর্ব্ব-নাশ করিয়া মহাদেবের উপর জয়লাভ করেন।

যে দেশে যে সময়ে ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী রাষ্ট্র শাসন করেন, সে দেশে সে সময়ে সকলই সম্ভবপর হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তখন উলূকবাহন ধর্ম্মঠাকুরের তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্ডীর আদেশে হনুমান্ ধনপতি সদাগরের ডিঙা ডুবাইবার আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, সীতাপতি যাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, যাঁহার ব্রহ্মবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রতেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, যিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিমা ভুলিয়া গিয়া, নূতন

করিয়া সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মহাচীন দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন এবং সেই মহামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়া "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে" এই উপদেশ-মতে বীরভূম জেলায় রামপুরহাটের নিকট তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

বশিষ্ঠ ঋষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত ঋক্‌মন্ত্র দর্শন করিয়া মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষা প্রাকৃত ভাষার নিকট অভিভূত হইয়া থকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের নির্ব্বাসনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিকপন্থা-প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর-মিলিবে। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণের পাঁচ পুরুষ পরে যে বংশ-ধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম আউ আর গাউ; কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম হারো আর নারো; ভরদ্বাজ-গোত্রজ শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষ আবর আর পাবর আর সাবর। সে কালের আদর্শ রাজার নাম লাউসেন, রাজমহিষীদের নাম উতুনা আর পুতুনা; শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্নীদের নাম খুল্লনা আর লহনা। যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপন পুত্রকন্যার নামকরণে এই খাঁটি বাঙ্গলা নামগুলির ব্যবহারের জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা অগ্রণী হউন; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব।

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাল-রাজারা বর্ত্তমান ছিলেন

এবং সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হাওয়া বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ আমরা অনুমান করি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি শূন্যপুরাণ নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন; সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিয়া আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রন্থমধ্যে উহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করা যাইতে পারে।

এই মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ঐ গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা এক নূতন জিনিষ,—কতকটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ গ্রন্থের বয়স কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের বিখ্যাত গ্রন্থকার তোড়রমলের সভায় কৃত্তিবাস,কালিদাস ও কবিকঙ্কণকে একসঙ্গে উপস্থিত করিয়া সেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বৎসর পিছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এই শূন্যপুরাণই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, তাহাই বা কিরূপে বলিব? মহীপাল ও যোগীপালের গীত আমাদিগকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে অধুনা-বিলুপ্ত হাকন্দপুরাণ বাঙ্গলা দেশে এককালে ভাগবত পুরাণের অপেক্ষা বেশী আদর পাইত, তাহার নামেই, বোধ হয়, উহা সংস্কৃত ভাষার

বড় ধার ধারিত না। এই শূন্যপুরাণের কত কাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব? ফলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাল-রাজাদের সময়ে ডোমে যখন পৌরোহিত্য করিত ও হাড়িতে যখন গুরুগিরি করিত, ব্রাহ্মণ্য যখন অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া মুখ লুকাইয়াছিল, মহাদেব যখন কোচপাড়ায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া কোচবধূদের সহিত রহস্যালাপ করিতেন, এবং লাঙ্গল-হাতে জমি চষিতে প্রবৃত্ত হইয়া মশার কামড়ে বিপন্ন হইতেন, ধর্ম্মের গাজনে ঢাকের বাদ্যে পল্লীসমাজ যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত-রসের একত্র সমাবেশের সময়ে, বাঙ্গলার শস্যক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের বারিধারার বেগ মাথার উপরে বহন করিয়া, উৎখাত-প্রতিরোপিত ধান্যের হরিদ্বর্ণ চারাগুলি জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের কণ্ঠে গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যে কীর্ত্তিকথা গীত হইত, তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইতে পারি।

দক্ষিণ দেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেনরাজারা বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করিয়া হাওয়ার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বঙ্গের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালের ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণকে সদাচার শিখাইবার জন্য তৎকালের রাজা ও রাজমন্ত্রী একযোগে দান-সাগর ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব রচনা করিলেন, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা দিলেন, যে জনসঙ্ঘ শাস্ত্রশাসন অবহেলা করিয়া যোগী গুরু ডোম পুরোহিতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থান দিলেন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী দেবভাষায় গ্রথিত হইয়া ভাবুক জনকে নূতন রসের আস্বাদন দিয়া নূতন পথের পথিক করিল। মুসলমান আসিয়া সেনরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন,

কিন্তু সেনরাজারা যে নূতন বাতাস বহাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই রাষ্ট্রবিপ্লবেও নিবৃত্ত হয় নাই। দণ্ডধারী রাজা যে সমাজসংস্কার ও সমাজ-শাসনের কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইলেও সমাজ সেই কার্য্য স্বয়ং চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বন্ধনের পর বন্ধন আঁটিতে লাগিলেন; কুলীনদিগের মেল-বন্ধনে ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা ঘটিল। রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাণকথা ক্রমশঃ মহীপালকে ও মাণিকচাঁদকে স্থানভ্রষ্ট করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সুধাস্রোত বহাইলেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদেরা তাহাতে গৌড়ভূমি ভাসাইয়া দিলেন। এই কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত; ইহার সবিস্তার বর্ণনা অনাবশ্যক।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। ঠিক দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই সভাস্থলের অনতিদূরে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অঙ্কের অভিনয়ের যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী বা বিদেশী যে সকল অভিনেতা সেই যবনিকাপাত-কালে অভিনয়-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা এখন কোথায়, কি অবস্থায় বিদ্যমান আছেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু চিত্রগুপ্তের কোন্ খাতায় তাঁহাদের নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের ফলভাগ যদি বংশধরকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্মুখে রাখিয়া, বিধাতার দরবারে ক্ষমা-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার অধিকার আমাদের কিছুতেই থাকে না। যাহাই হউক, বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক

বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।

যুগে যুগে যুগ-ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি সম্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্ভব প্রতীক্ষায় যাঁহারা বসিয়া আছেন, এ কালের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহাদের চলিবে না। সুখের বিষয় যে, বিধাতৃ-প্রেরণায় মানব-সমাজে যখন যে হাওয়া বহে, তাহাতেই সেই যুগ-ধর্ম্ম নিরূপিত করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা গর্ব্বের সহিত অনুভব করিতেছি যে, অধুনাতন বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি আমাদের সকলের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতা তাঁহার মুখ দিয়াই এ কালের যুগধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্যামা মায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদ তাঁহার পাগলী মায়ের চরণতলে আপনার মন-প্রাণ যোল আনা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। এই আত্মনিবেদন-উপলক্ষে তিনি যে গীত গায়িয়াছেন, তাহার ধ্বনি আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়া মরমের তারে ঝঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপা মহারৌদ্রী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা শ্যামাঙ্গিনী জননীর হস্তধৃত করাল খড়্গ রামপ্রসাদের হৃদয়ে কোনরূপ আতঙ্ক জন্মাইত না, তাঁহার রাঙা পায়ের রক্তজবার অভিমুখে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকিত এবং তিনি সেই রক্তজবায় দৃষ্টি রাখিয়া, তন্ময় হইয়া নিরবধি আনন্দসুধা পান করিতেন। তাঁহার চোখে মায়ের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অন্যের চোখে হয় নাই।

সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কাল-ভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। "বন্দে মাতরম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে

আর কোন বাঙ্গলী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবীরা এই মূর্ত্তি দর্শনের জন্য বাঙ্গালীকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রবাস-যাত্রী মধুসূদন দত্ত "সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ" এই চিন্তায় যখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য এই শ্যামা জন্মদার প্রতি অশ্রুসিক্ত লোচনে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যখন এই জননীকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন স্পন্দিত হইত, তেমন আর তাঁহার অন্য কোন আহ্বানে ঘটিত না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে ঐ পত্রিকায় দশ মহাবিদ্যা নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইরাছিল। ঐ প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহার সহচর ও সহবর্ত্তীরা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত হইয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি। ঐ প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মূর্ত্তি সকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, জননী আপন হাতে আপন মাথা কাটিয়া ছিন্নমস্তা সাজিয়াছেন; তাঁহার ছিন্ন কণ্ঠ হইতে সমুদ্গত শোণিত-ধারা ডাকিনী-যোগিনীতে পান করিতেছে। কোন্ তারিখে কোন্ স্থানে জননী আপন হাতে আপন মাথা ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধ-লেখক খুলিয়া বলেন নাই। মায়ের এখনকার মূর্ত্তি ধূমাবতী—বর্ষীয়সীর দেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ কেশ, গায়ে ধূলি উড়িতেছে। ভাঙ্গা রথের মাথার উপর কাক ডাকিতেছে।

সেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মূর্ত্ত্যন্তর দেখিয়াছিলেন ; সে মূর্ত্তি মায়ের ষোড়শী মূর্ত্তি—মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলা মূর্ত্তি—মা যাহা হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তি-বিহ্বল-স্বরে ডাকিয়াছিলেন,—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি ? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবীমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্য-সেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তি-পথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙা চরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তি-

পূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ"—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে পারে। এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা এই সাহিত্য-সম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণী সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্যের আবর্জ্জনা-অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা-নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি আছে। এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও আমরা সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া সমবেত শক্তিপ্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্য-সেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমার অপেক্ষা স্পষ্টতর ভাষায় পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেই কর্ম্মের

জন্য আহ্বান করিয়াছেন। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এই উদ্দীপনাময় কাতর আহ্বান তাঁহার কণ্ঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বে মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত হইয়াছে। "আমরা এসেছি আজ মায়ের ডাকে" বলিয়া তিনি যখন বীণার তারে আঘাত করিয়াছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধারা বেগে বহিয়াছে। "আগে চল্ আগে চল্ ভাই" বলিয়া তিনি আমাদিগকে পুরোগমনে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেই পঙ্গুচরণ লম্ফ প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছে; মরা গাঙে বান দেখিয়া যখন তিনি জয় মা ব'লে তরী ভাসাইতে বলিয়াছেন, তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মিলনের এই দুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।

আহ্লাদের বিষয়, আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্ভাবনা নাই। এই সাহিত্য-সম্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, জননীর পরিচয়-লাভই সে সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

একটি কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাহি যে, আজিকার সভায় যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাবের অনুযায়ী কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে। আপনারা বোধ হয় জানেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যসভা আজ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত আছেন। অল্প অর্থবল এবং অল্পতর লোকবল লইয়া সাহিত্য-পরিষৎ যতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহস্রাধিক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষৎ বিস্মৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস, কাশীদাসের মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পোনের বৎসর পূর্ব্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সাহিত্য-পরিষৎ অনেকাংশে সেই অস্পষ্টতা দূর করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের হাতের লেখা পুঁথি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব ও বাঙ্গলা ভাষার গঠন-প্রণালী সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষদের কৃত কর্ম্মের ফর্দ্দ দিয়া তাহার পক্ষে ওকালতির জন্য আমি আজ আসি নাই। তবে সাহিত্য-পরিষদের সম্প্রতি একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি। সেই আকাঙ্ক্ষাটি অন্যতর প্রস্তাবরূপে আপনাদের সম্মুখে যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবটির গুরুত্ববোধে আমি একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। সাহিত্য-পরিষৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ

করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতেলেখা প্রাচীন পুঁথি সেই খানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীস ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরাজ-সরকার বাঙ্গলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন. তাহা সেই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবে।

মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব। চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবতার পূজক ছিলেন, কবিকঙ্কণ স্বপ্নাবেশে চণ্ডীদেবীর যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনার গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস যে ভিটায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস যে কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রসাদ যে আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন, এই সকলের ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর শোভিত করিবে। শ্রীচৈতন্যের হস্তাক্ষরের পার্শ্বে নিত্যানন্দের ছড়ি বিদ্যমান থাকিবে। রামমোহন রায়ের পার্শ্বে হেমচন্দ্রের পাষাণ-মূর্ত্তি

উপবিষ্ট থাকিবে। বিদ্যাসাগরের পাদুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী শোভা পাইবে।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইবে। বাঙ্গলার যে যে স্থান বিরাট রাজার নামে বা কর্ণসেনের নামের সহিত জড়িত আছে, চাঁদ সদাগরের বা বেহুলা ঠাকুরাণীর স্মৃতির সহিত মিশিয়া আছে, সেই সকল স্থানের চিত্র আমরা সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইব। প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দর্শনীয় যেখানে যে কিছু আছে, তাহার চিত্রও আমরা সেইখানে দেখিব। প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙ্গা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও তার্কিক শিরোমণি হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও তারকনাথ তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের বংশলতা ও জীবনচরিত সংগৃহীত হইবে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবে।

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব। বাঙ্গলার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই।

এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃ-প্রতিমা নাম দিতে পারি। সাহিত্য-পরিষদের এই আশার কথা ও আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বহু আশা বুকে বাঁধিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা ইহার অনুমোদন করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু "অল্পানামপিবস্তূনাং সংহতিঃ" যখন কার্য্যসাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে।

এই মন্দির-গঠনে প্রভূত লোকবল ও প্রভূত ধনবল আবশ্যক। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীরা লোকবল জোগাইতে পারেন; কিন্তু ধনবল তাঁহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলার ধনীদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আজকার দিনে যখন বাঙ্গলার ধনী দরিদ্র সকলেই মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন মায়ের কাজের জন্য ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, এই আশা করি। বঙ্গের ধনিগণ ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপূজায় নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের ধনবত্তা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা।

যাঁহার উদ্যোগে ও আহ্বানে আমরা আজ এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের সফলতার জন্য মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্যলাভে বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলন আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। গত বৎসর আমরা আতিথ্য-

লাভের আনন্দভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম ; নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্যসেবকেরা বিনাবাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সম্যক্ হেতুও বর্ত্তমান ছিল। মহিমচন্দ্রের বিনয়মণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে বঙ্গসমাজ যে তমোমিলন হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্চিৎ আচ্ছাদিত রাখিয়া আজ অতিথিরূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য যিনি আপনার অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়া মর্ম্মস্থলে সঙ্গোপন করিয়া বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথিসংকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন না করিলে আমাদের ধর্ম্মহানি হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্ম্মাণবিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করি আমাদের এই সময়ের অনুপযোগী ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্ব্বাপণ মানুষের সাধ্য কি না, তাহা জানি না, তবে পুণ্য-কর্ম্মের জাহ্নবীবারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে। এই সারস্বত সম্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ যে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম

বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয়, এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্ঠিত সহস্র পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অন্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া, আমি আপনাদিগকে সাহিত্যসম্মিলনের কর্ত্তব্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।